মোগল সম্রাটের অন্দরমহল

বারিদবরণ ঘোষ

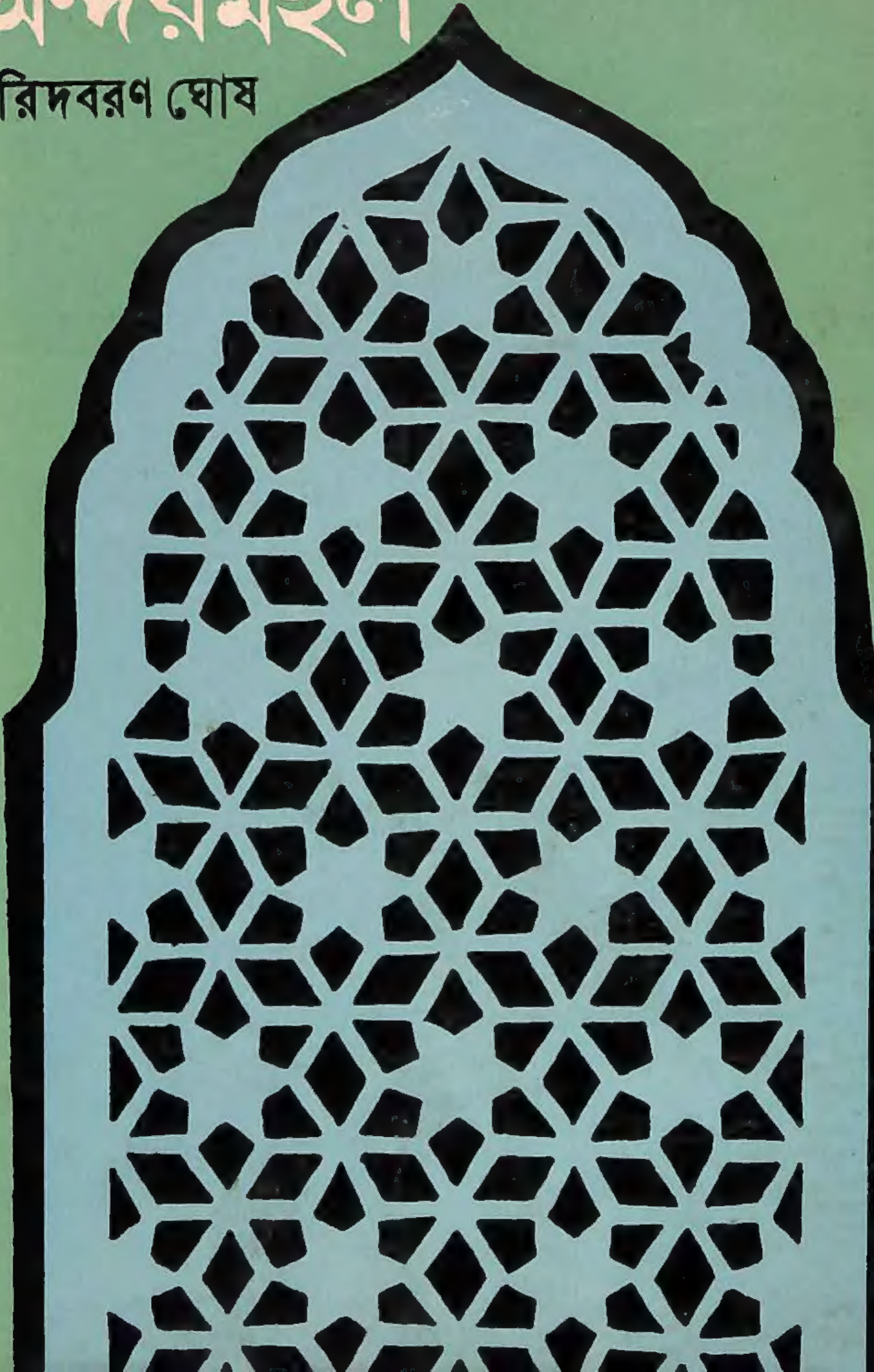

মোগল সম্রাটের অন্দরমহল

বারিদবরণ ঘোষ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৫
কার্তিক ১৩৯২

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রক
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

Acc. No. — 14665

১৫ টাকা

শ্রীরমাপদ চৌধুরী

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

বাবরের অন্দরমহল	...	১
বাবর-কন্যা গুলবদন	...	১৬
হুমায়ুনের অন্দরমহল	...	৩১
আকবরের অন্দরমহল	...	৫৩
জাহাঙ্গীরের অন্দরমহল		৬৫
সাজাহানের অন্দরমহল	...	৮৩
জাহানারা	...	৯৪
রোশেনারা	...	১০১
ঔরংজীবের অন্দরমহল	...	১০৪
জেবউন্নিসা	...	১১৩

আদিকথা

মোগল সম্রাটদের অন্দরমহল, তাঁদের ভাষায় যার নাম হারেম—সে ছিল এক অভূতপূর্ব স্বশাসিত সমাজ বিশেষ। হারেম চিরকাল আমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে এসেছে। কিন্তু অজস্র প্রহরী, খোজা ভৃত্য, রূপসী পরিচারিকার দুর্ভেদ্য প্রহরাকে অতিক্রম করে কারও পক্ষে সেখানের পুরোপুরি ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা থেকে শুরু করে এখনও হায়দ্রাবাদের নবাবদের হারেম নিতান্ত গবেষণার বিষয়। কারও হারেম ছিল রাজপ্রাসাদের নির্দিষ্ট এক অন্তঃপুরে, কারও হারেম কোনো প্রাসাদের কোনো ক্ষুদ্র অংশ নয়, ছিল একটা গোটা শহর। কারও হারেমে ছিলেন হয়তো দশটি বা তার কাছাকাছি নারীগণ, আবার আকবরের হারেমে শুনেছি পাঁচ হাজার মহিলা ছিলেন। মনে রাখতে হবে এঁরা সকলেই বিবাহিত পাত্রী ছিলেন না। বেশির ভাগই ছিলেন উপপত্নী শ্রেণীর—উপভোগের পাত্রী। তার বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ং সম্রাটগণই দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার বাবরকে দিয়ে শুরু হয়ে ঔরংজীবের পরেও কিছুকাল বিস্তারিত ছিল। কিন্তু সত্যিকথা বলতে বাবরকে দিয়ে এই সাম্রাজ্যের প্রবেশ এবং ঔরংজীবকে দিয়েই এর যথার্থ প্রস্থান ঘটে। এর পরেও যাঁরা ছিলেন (বাহাদুরশাহ থেকে) তাঁরা এই বিশাল নাটকের উল্লেখ-যোগ্য কুশীলব ছিলেন না। সেজন্য বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান আর ঔরংজীবকে নিয়েই আমাদের অন্দরমহলের আসর বসিয়েছি। এঁদের বিবাহিত স্ত্রী এবং উপপত্নীদের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। কল্পনাশক্তিকে প্রখর করে আমরা অনৈতিহাসিক কিছু লেখার ব্যাপারে উৎসাহও খুব একটা পাই নি। ইতিহাসে যাঁদের বিশ্বাসযোগ্য উল্লেখ আছে, মাত্র তাঁদেরই আমরা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এসব বিবরণ বলা বাহুল্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণ (?) যেমন কিছু পরিমাণে লিখে গেছেন, তেমনি সম্রাটগণ বা সম্রাট পরিবারের কোনো কোনো ব্যক্তিরাও লিখে গেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন বিদেশী পরিব্রাজক, দূত বা তথাকথিত ইতিহাস ব্যবসায়ীদের কিছু রচনাও। সবটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে তবেই তথ্যকে গ্রহণ করতে হয়েছে। পারতপক্ষে ইতিহাস-বহির্ভূত কোনো বিষয়কে আমরা গ্রহণ করতে নারাজ হয়েছি।

সম্রাটদের পত্নী-উপপত্নী-রক্ষিতাদের কথা ছাড়াও অন্দরমহলের চারটি

কন্যার কথাও আমরা এই বইয়ের পরিধিভুক্ত করেছি। কারণ এঁরা অন্দর-মহলের চিত্রটিকে বহুলাংশে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। এঁরা হলেন বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম, সাজাহান-তনয়াদ্বয় জাহানারা ও রোশিনারা বেগম এবং ঔরংজাবপুত্রী জেবউন্নিসা বেগম। আসলে এতেও চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। প্রত্যেক মোগল সম্রাট মানুষ হয়েছিলেন তাঁদের গর্ভধারিণীর লালনে নয়, বরং ধাত্রীমাতাদের স্নেহে। এই ধাইমা এবং দুধমায়েরা মোগল অন্দর-মহলের এক বিশিষ্ট ভূমিকাগ্রহণকারিণী ছিলেন। আকবরের ধাত্রীমাতা মাহম অনগ তো রাজ্যশাসনেও গৌণভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। তেমনি ছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত পরিচারিকা বা সঙ্গিনী। যেমন সতী-উন্নিসা। সতী-উন্নিসা ছিলেন মমতাজমহলের সঙ্গিনী—এক অভিজাতবংশের কন্যা। জাহাঙ্গীর তাঁকে Prince of poets উপাধি দেন। কবিতা, ভেষজবিদ্যা, কোরাণ ধর্মশাস্ত্রে ছিল তাঁর আশ্চর্য অধিকার। মমতাজের দেহাবসান হলে তিনি তাঁর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাবার সম্মান পান। সমস্ত রাজকীয় বিবাহে তিনি কনের বাড়িতে উপহার বয়ে নিয়ে যেতেন। আবার বিয়েতে সম্রাট বা সম্রাটপুত্ররা যা পেতেন—যেমন দারার বিয়েতে—সেই সব উপহার সব গুছিয়ে রাখতেন তিনিই। আসলে তিনিই ছিলেন হারেমের অধ্যক্ষা। নিজের কোনো সন্তান না থাকায় ভাই তালিবার দুটি মেয়েকে পোষ্য হিসাবে মানুষ করেন। ভালবেসে তাঁদের বিবাহ দেন। এই সতী-উন্নিসার মতো কতো পরিচারিকারাই এই অন্দরমহলের প্রতি পরতে সংযুক্ত। তেমনি ছিল অজস্র খোজা আর হাবশী প্রহরীরা। এদের সকলের কথা লিখলেই হয়তো ছবিটি আরও পূর্ণাঙ্গ হত।

ছবি আরও পূর্ণাঙ্গ হত যদি মোগল অন্তঃপুরিকাদের জীবনের আরও খুঁটিনাটি দিতাম। কেমন করে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা পোলো খেলতেন, (বিশেষ কেমন করে তাঁরা সাজপোশাক পরতেন (নূরজাহান তো নতুন পোশাকই বানাতেন), কেমন করে আকবর জীবন্ত উলঙ্গ ক্রীতদাসীদের ছকে বসিয়ে ঘুঁটি খেলতেন, সে সব উদ্দামতার ছবি দিতে পারলে বেশ ভাল হত। সব কথা তো সব জায়গায় দেওয়া যায় না। আমার মূল লক্ষ্য ছিল মোগল সম্রাটদের পত্নী-উপপত্নীদের—তাঁদের প্রেম-ভালবাসা-অবহেলা-রাজনীতিনিয়ে একটা বিশ্বাসযোগ্য চিত্র রচনা করা। তথ্যের অপ্রাচুর্য এই চিত্রকে পূর্ণরূপ দিতে দেয়নি সত্য, কিন্তু একটা জীবনধারা তাতে হয়তো ধরা পড়ে গেছে।

বা ঔরংজীবের প্রতিদিনেব যে রুটিন ছিল তার মধ্যে হারেমেরও

একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল। সাজাহান হারেমে যেতেন দুপুর বারোটায় এবং রাত সাড়ে আটটায়। রাতে গিয়ে প্রথমে শুনতেন গানবাজনা। তারপর পত্নীদের কাছে। মোটামুটি রাত সাড়ে দশটা থেকে ভোর সাড়ে চারটে ছিল পত্নীদের সান্নিধ্যে তাঁর নিদ্রার সময়। রাত্রে ঘুমোবার আগে তিনি নিয়মিত পড়াশুনো করতেন। ভারী পর্দার আড়ালে বসে অন্য মেয়েরা তাঁর উচ্চৈঃস্বরে পাঠ শুনতেন। তিনি পড়ে শোনাতেন ভ্রমণকাহিনী, সন্তকাহিনী বা কখনও তৈমুর বা বাবরের আত্মজীবনীর অংশ। ঔরংজীবও হারেমে যেতেন দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ। খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমোতেন। আবার রাত্রি আটটায় হারেমে গিয়ে প্রার্থনা ও ধ্যান করার পর তবে আহার-শয়নাদি করতেন। বাবর-আকবরের সময়ের কোনো ঠিকই ছিল না।

এই বইটি লিখতে গিয়ে আমি প্রাপ্তব্য প্রায় সব বই-ই দেখেছি। Dowson & Elliot-এর সম্পাদিত মোগল ঐতিহাসিকদের বিবরণী আমার খুব কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত তারিক-ই আকবরী আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। প্রেমময় দাশগুপ্ত অনূদিত গুলবদনের বিবরণ থেকে আমি যত্রতত্র উদ্ধৃতি দিয়েছি। যদুনাথ সরকার, কালিদাস নাগ আমাকে যথোচিত সাহায্য এনে দিয়েছেন। বাবর-জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, Stanly Lane Poole, Prawdin, ঈশ্বরীপ্রসাদ, বানারসীপ্রসাদ সাকসেনা, লক্ষ্মীনারায়ণ অগ্রবাল, এ. এল. শ্রীবাস্তব, বেণীপ্রসাদ, বি. পি. চোপরা, বেনিয়ার, টমাস রো, মানুচ্চি, ট্যাভেরনিয়ার—সকলের কাছে, আমার ঋণ বিপুল পরিমাণ।

বইটি প্রকাশের সঙ্গে একজন সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত আছেন। তিনি শ্রীরমাপদ চৌধুরী। তাঁর আগ্রহেই মমতাজমহলের প্রসঙ্গটি আমি প্রথম লিখি এবং তিনি সযত্নে তা আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় বিভাগে প্রকাশ করেন। তাঁর স্নেহপ্রীতিবশতই ঐ বিভাগে আমার জাহানারা ও রোশিনারার কথাও প্রকাশিত হয়। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করে নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করছি।

আমি যে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি, সেই শ্রীগোপাল ব্যানার্জি মহাবিদ্যালয়ের মূল্যবান গ্রন্থাগারটি অকৃপণ ভাবে তাঁর বইগুলি আমাকে সরবরাহ করেছে। এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মী আমার কাছে তাই স্মরণীয়। আর আমার 'মহিষী' এবং কন্যা দুটি এই অন্দরমহল রচনায় অন্দর-মহলের যাবতীয় আনুকূল্য করেছেন—সেকথাও প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করি।

১লা আষাঢ় ১৩৯২ — বারিদবরণ ঘোষ

বাবরের অন্দরমহল

বসবাস যোগ্য পৃথিবীর এক প্রান্তসীমা'র একটি ছোট রাজ্যে ফরগনার অধিপতি ওমর শেখ মির্জা। দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর। আর দারুণ দুঃসাহসিক। তাই একসময় তাঁর রাজ্যের সীমানার মধ্যে ঢুকে গেল পাশের রাজ্য সমরখন্দের অনেকখানা। ছোট রাজ্য বড় হল। তাঁর ছোট সংসারও ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে। স্ত্রী আর রক্ষিতা মিলিয়ে অন্ততঃ পাঁচজন নারী তাঁর অন্দরমহল ভরিয়ে রেখেছেন। এঁদের গর্ভে তাঁর তিনটি পুত্র আর পাঁচটি কন্যার জন্ম হয়েছে। মোঙ্গল য়ুনুস খানের মেয়ে কুটলুক নিগার খানুমের গর্ভে জন্মেছিলেন কন্যা খানজাদা বেগম (জন্ম ১৪৭৮ খৃঃ) আর পুত্র জহীর-অদ্-দীন। মোঙ্গললললনা ফাতিম সুলতানের গর্ভে জন্মেছিলেন একটি পুত্র জহাঙ্গীর মির্জা (১৪৮৫ খৃঃ)। দুই কন্যা মিহর্‌বানু বেগম (জন্ম ১৪৭৮ খৃঃ) আর শেহরবানু বেগম (জন্ম ১৪৯১ খৃঃ) আর একটি পুত্র নাসির মির্জার (জন্ম ১৪৮৭ খৃঃ) জন্ম দিয়েছিলেন অন্দিজানের এক উপপত্নী উমেদ অগাচহা। আর দুই রক্ষিতা অঘা শুলতান আর সুলতান মখদুম জন্ম দিয়েছিলেন দুই কন্যা সন্তানের। তাঁদের নাম যথাক্রমে ইয়াদগার সুলতান বেগম ও রুকিয়া সুলতান বেগম। এঁরা দুজনেই জন্মেছিলেন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁদের পিতার মৃত্যুর পর।

এঁদের মধ্যে জহীর-অদ্-দীন নামটি নিরক্ষর মোঙ্গলেরা ঠিক উচ্চারণ করে উঠতে পারতো না। এঁর জন্ম হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে। বছরটা ছিল ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ। উচ্চারণ পরিবর্তনে এই শিশুপুত্রের নামকরণ হয়ে গেছিল বাবর। ইতিহাসে তিনি এই নামেই পরিচিত।

তখনও বাবরের বয়স পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছ'য়ে পড়েনি—তিনি বেড়াতে এলেন মা-বাবার সঙ্গে ফরঘানা থেকে সমরখন্দে। সেখানে চলছে এক দারুণ বিয়ের বিশাল উৎসব। সেই উৎসবে এসেছেন শিশুকন্যা আয়শাকে নিয়ে তাঁর :পিতা সুলতান আহ্‌মদ। ছোট ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে ওমরশেখ মির্জা আর তার প্রধানা বেগম কুটলুক নিগার খানুমের দারুণ পছন্দ হয়ে গেল। অমনি ঠিক হয়ে গেল আয়শাই হবেন বাবরের ভাবী পত্নী। বাগদত্তা বধূ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে রইলেন তিনি ভবিষ্যৎ মোগল

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বাবরের সঙ্গে পরিণীতা হবার জন্যে।

সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার যাঁদের লক্ষ্য হয়, জীবনে তাঁদের দুর্বিপাক আর বিপদ আসে পদে পদে। এরই মধ্যে বেছে নিতে হয় জীবনের অবকাশ, খুঁজে নিতে হয় জীবনের সঙ্গী। খোজেন্দের সমরক্ষেত্রের দুঃখময় দিনগুলির মধ্যে সান্ত্বনা পেতেই বুঝি বাবর তাঁর জীবনের সঙ্গিনী হিসেবে প্রথম বরণ করে নিলেন তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ আয়শাকে।

বাবর এখন পূর্ণ সতেরো বছরের টগবগে তরুণ। প্রথমা মহিষী আয়শা গর্ভবতী হয়ে আছেন সমরখন্দে। শেষে সেখানেই তিনি জন্ম দিলেন বাবরের প্রথম সন্তান, একটি কন্যা সন্তান—ফখ্‌রন-নিসা। ১৫৩১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাস—মেয়েটিকে পেয়ে বাবরের আনন্দ ধরে না। কিন্তু এ সুখ ক'দিনের জন্যে। আয়শার ভাগ্যে কি এতো সুখ অপেক্ষা করে আছে। একটা মাস কোনোক্রমে পার হয়েছে। চল্লিশটা দিনও পুরো হয়নি। তাঁর বুকের দুলালী ফখ্‌রন চলে গেল তাঁকে ছেড়ে।

শুধু কি কন্যাটিই তাঁকে ছেড়ে চলে গেল? বাবরও কি তাঁর থেকে ধীরে ধীরে দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছেন না? পাঁচটা বছর যেতে না যেতেই বাবর বিয়ে করে বসেছেন আরও একজনকে। সে আবার পর নয়, তারই ছোট বোন মাসুম।

বাবর তখন হেরাতে শ্যালিক-শ্যালিকাদের সঙ্গে দারুণ স্ফূর্তি করে জীবনের ছাব্বিশটি একটানা আরামের দিন কাটাচ্ছেন। একেবারে ছোট্ট শ্যালিকা, দেখতেও দারুণ সুন্দর আর চটকদার মাসুম গভীরভাবে বাবরের প্রেমে পড়ে গেলেন। মাসুম দিন রাত ভুলে গেলেন, ভুলে গেলেন তার সকল বাধা নিষেধ। দিদির গর্জনতর্জন, কান্নাকাটি সব ব্যর্থ হল। মাসুম হয়ে গেলেন বাবরের ঘরণী। অথচ আয়শা একটি বছরের মধ্যে বাবরকে তো কখনও স্ত্রীলোকের ব্যাপারে এমন আগ্রহী দেখেন নি।

আসলে আয়শা বুঝতেই পারেন নি যে বাবর তাঁকে ভালবাসতেনই না। কর্তব্যের খাতিরে, সত্যরক্ষার খাতিরে বিয়ে করেছিলেন মাত্র। কিন্তু আয়শা কি সহ্য করতে পারেন, তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে, তাঁরই ছোট বোন তাঁরই স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? তিনি যেন

রাধার মতই বলে উঠতে চেয়েছিলেন—'আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া।'

কিন্তু কি করতে পারেন তিনি একাকিনী নারী। বাবর তরুণ, উদ্দাম আর উচ্চাভিলাষী। রক্তের নোনা স্বাদ যেন তার যৌবন আবেগকে আরও ঘনীভূত করেছে। আয়শার কাছে যা পাননি, তা পেয়েছেন মাসুমের কাছে। প্রেমের উপলব্ধি ঘটছে নতুন করে। মাসুম জানে ভালবাসতে, কাছে পেতে, আকর্ষণ করতে।

অতএব বিদায় নিতে হল আয়শাকে। হেরে গেলেন তিনি—মায়ের পেটের ছোট বোনটার কাছে। অন্দরমহলের এক কোণে দাসীবাঁদীদের মতই তাঁকে থাকতে হল। মির্জা হিন্দালের, বাবরের এক সন্তানের বিয়ের ভোজের বিশাল উৎসবে তাই তাঁকে আমরা যখন দেখেছিলাম অন্যান্য বেগম আর নারীদের সঙ্গে বসে থাকতে, বড় করুণ দেখাচ্ছিল তাঁকে।

কিন্তু শুধুই কি তাঁর চোখে কারুণ্য ঝরে পড়েছিল? ঠোঁটের পাশে এক ঝিলিক বিদ্রূপের হাসি দেখা দেয় নি? দেয়নি প্রতিহিংসা পালনের এক পরিতৃপ্তির ঝিলিক? তখনও কি তিনি ঐ উৎসবের বিশাল আয়োজনের মাঝে বসে বসে ভাবছিলেন না—পারলো কি মাসুম আমাকে শেষ অবধি হারিয়ে দিতে? পারলো কি মাসুমের গর্ভজাত কোনো পুত্র বাবরের সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে? পারলো কি তার কোনো পুত্র-কন্যা মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তারের মধ্যে কোথাও ঠাঁই নিতে?

ভাবতে গিয়ে চোখের কোণে কি জল এসে গেছিল তাঁর? না, ওটা বুঝি মনের ভুল। ছোট বোনটাকে কি কম ভালবাসতেন আয়শা? আহা রে বেচারা ভালবেসেই মরে গেল। ভালবাসল বটে, ভোগ করতে পারলে না। যথাসময়ে মাসুমের ঘর আলো করে একটা ফুলের মতো মেয়ে জন্মালো। আয়শারও তো একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছিল। না, আয়শা পারে নি তাকে বুকের বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে। পেরেছিল মাসুম। কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি বাবরের প্রিয়তমা মহিষী মাসুম। কন্যা সন্তানকে জন্ম দিয়ে সে বিদায় নিয়েছিল পৃথিবী থেকে। আয়শার কি একবারও মনে হয় নি—অপরের অধিকারে নাক গলাতে

গেলে তারও অমনি পরিণতি হয়! কে জানে?

ভারি মুষড়ে পড়েছিলেন বাবর। কাবুল জয়ের অপরিমিত আনন্দে বুঝি কিছুটা ভাটা পড়ে গেছিল। মায়ের স্মৃতিকে চিরজাগরূক করে রাখতেই মেয়ের নামও রেখেছিলেন মায়ের নামেই—মাসুম। মাসুম সুলতান বেগমের মেয়েও মাসুম। অনেক পরে ঐ হেরাতেরই সুলতান হুসেনের নাতি মুহম্মদ জামান মির্জার সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

না, কেউ পারল না বাবরের মহিষী হয়ে থাকতে—না আয়শা, না মাসুম। তাই বলে যদি ভেবে বসি বাবর আর বিয়ে করলেন না মাসুমের শোকে—ভুল করবো। মোগল অন্দরমহল কখনও নীরব থাকে নি। বাবরের অন্দরমহলেও ছিল তাঁর বিবাহিতা এবং রক্ষিতার দল। ছিলেন হিসারের সুলতান মাহমুদের কন্যা জয়নাব, ছিলেন দিলদার আগাচহা—সুখ্যাত হিন্দালের আর গুলবদনের গর্ভধারিণী, ছিলেন রায়কা, ছিলেন য়ুসুফজায় প্রধানের কন্যা মুবারিকা।

আরও ছিলেন হেরাতের সুলতান হুসেনের পরিবারের ললনা মাহম বেগম—তাঁর প্রধানা মহিষী এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র হুমায়ুনের গর্ভধারিণী জননী এবং কামরানের মা গুলরুখ।

বাবরের জীবনে জয়নাবের যে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তা মনেই হয় না। কাবুল জয়ের সময় তিনি এঁকে বিয়ে করেছিলেন। তার-পর প্রায় সাধারণ স্ত্রীর মতোই অন্দরমহলে জীবন অতিবাহিত করে-ছিলেন। রায়কাও তাই।

সেদিক থেকে বাবরের আফগানী স্ত্রী মুবারিকার ভূমিকা নগণ্য ছিল না। জীবনে শুধু নয়, মরণের পরেও বাবর তাঁর ভালবাসার আস্বাদ যেন গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে যেখানে তাজমহল, তার ঠিক উল্টো দিকে, যমুনা নদীর অন্য তীরটিতে আরাম বাগে (রামবাগ নামেই সুপরিচিত) একটি সমাধি নির্মাণ করে বাবরের যে মরদেহ প্রথম সমাহিত করা হয়। পরে সেই সমাধিস্থল থেকে কাবুলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় একটি দারুণ সুন্দর সমাধিক্ষেত্রে। বাবরের অনেক আত্মীয়স্বজন

সেখানে সমাহিত ছিলেন আগে থেকেই। এই স্থানান্তরীকরণ ঘটিয়েছিলেন বাবরের ঐ আফগানী স্ত্রী মুবারিকা।

সত্যি কথা বলতে কি বাবরের সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে গণনীয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর তিন স্ত্রী—গুলরুখ, দিলদার আর প্রধানা মহিষী মাহম। প্রথমা পত্নী আয়শার গর্ভজাত কন্যাটি যখন মারা গেল, বাবরের স্নেহ-বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় যখন সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য লালায়িত—তখনই তাঁর এই তিন স্ত্রী তাঁকে উপহার দিয়েছেন পর পর পনেরটি সন্তান।

এর মধ্যে গুলরুখ বেগমের কোল জুড়ে এসেছিল পাঁচটি সন্তান—চার পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্র চারটি হলেন—কামরান মীর্জা, আসকরী মীর্জা, শাহরুখ মীর্জা ও সুলতান আহমদ মীর্জা। কন্যার নাম গুলবার। অবশ্য এঁর একটা অন্য নামও ছিল—গুল-ই-জার বেগম। গুলরুখ ছিলেন বাবরের দ্বিতীয় স্ত্রী—আয়শার পরই তাঁকে বিয়ে করে ছিলেন। যদিও বাবর তাঁর এই স্ত্রীকে কাবুল প্রদেশ দান করে গেছিলেন, তবুও গুলরুখ কি পেরেছিলেন বাবরের অন্তরের সিংহভাগ কেড়ে নিতে?

দিলদার আগাচহার গর্ভে বাবরের ঔরসে জন্ম নিয়েছিলেন যে পাঁচটি সন্তান তার তিনটি ছিলেন কন্যা আর দুটি পুত্র। এর মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র আলওয়ার মারা গেছিলেন খুব অল্প বয়সেই, বড় দাদা হিন্দালের বয়স তখন মাত্র দশ। হিন্দাল জন্মেছিলেন ১৫১৯ খৃস্টাব্দে কাবুলে। অবশ্য যে পনেরোটি সন্তানের কথা বলেছি দু' জন বাদে সবাই জন্মেছিলেন কাবুলেই। হিন্দালের একটা পোশাকী নাম অবশ্য ছিল—আবুল নাসির। তাঁর দুই দিদি আর ছোট বোনের নাম ছিল যথাক্রমে গুলরং, গুলচিহ্‌রা এবং গুলবদন। গুলরং কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন নি, করেছিলেন খোস্ত-এ।

দিলদার বেগম ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ মা। ছোট ছেলে অলওয়ার মীর্জা ভুগে ভুগে দারুণ কাহিল। চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। বাবরের পিতৃহৃদয়ও ছিল বড় প্রশস্ত। পুত্রের এই মৃত্যু তাঁর বুকে হানল দারুণ শেলাঘাত আর মা দিলদার বেগম পুত্ররত্নকে হারিয়ে হয়ে উঠলেন একেবারে উন্মাদ।

দিলদারকে খুবই ভালবাসতেন সম্রাট বাবর। তাঁকে ভালবেসে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—এই তো সংসার দিল্। দুঃখ পেও না। ভেবে নাও না—এই হোল আল্লাহ্-র বিধান। তারপর সব বেগমদের ডেকে বললেন—চল আমরা কাবুল থেকে চলে যাই, কদিন বেড়িয়ে আসি ধউলপুর (ধৌলপুর) থেকে।

এমনি করে পরে আরও একবার হুমায়ুন বাবরের প্রধানা মহিষীকে, নিজের মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছিলেন গোয়ালিয়ারে। সেদিনও তিনি বিমাতা দিলদারকে সসম্মানে নিয়ে গেছিলেন। আবার দিলদারকে নিয়ে হুমায়ুন ধৌলপুরেও বেড়াতে গেছিলেন। দিলদারের তখন মনে পড়ে গেছিল বাবরের স্মৃতি। দু চোখ বেয়ে জল এসেছিল।

আসলে দিলদারকে খুবই ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন সম্রাট হুমায়ুন। যেখানে গেছেন সেখানেই তাঁকে সসম্মানে নিয়ে গেছেন। দিলদার যে তাঁর প্রিয় ভাই হিন্দাল এবং প্রিয় বোন গুলবদনের মা। কতোদিন পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ হাতে নিয়ে এসে দিলদারের কাছে মনের দরজা উন্মুক্ত করে বলেছেন—'হিন্দালই হচ্ছে আমার মনের বল-ভরসা, আমার চোখের মণি, আমার ডান হাত, আমার আদরের আর দারুণ ভালবাসার পাত্র। তাঁরই অনুরোধে দিলদারও নিজে গিয়ে পুত্র হিন্দালকে নিয়ে এসেছেন আলোয়ার থেকে হুমায়ুনের রাজধানীতে। দেখা হয়েছে দুই ভাইয়ে হুমায়ুনের বিপদের দিনগুলিতে।

দিলদারও হুমায়ুনকে দারুণ ভালবাসতেন। আর স্বপত্নীপুত্র কামরানকে দারুণ ভয় পেতেন। একবার তো কামরান দিলদারকে এমন দুঃখ দিয়েছিলেন যে তিনি কেঁদে একশা। কামরান চালাকি করে গুলবদনকে কিছুকাল নিজের কাছে রেখেছিলেন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দিলদারের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে। তখন থেকে কামরান যেন তাঁর চোখের বিষ হয়ে উঠলেন। পরেও অনেক আশঙ্কার সঙ্গে কামরানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন।

অথচ হুমায়ুনের অন্যায় আবদারকেও তিনি প্রশ্রয় দেন। হমীদাবানু বেগমকে বিয়ে করার জন্যে হুমায়ুন যখন পাগল তখন প্রথমে রাগ করলেও

পরে দৌত্যকার্যে দিলদারই এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য—হমীদাবানু বেগম প্রসঙ্গে।) এসব থেকে মনে হয় মোগলদের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও দিলদারের একটা অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল।

কিন্তু পাটরাণী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন মাহম বেগম। হেরাতের সুবিখ্যাত সুলতান হুসেনের পরিবারের মেয়ে তিনি। তৈমুরের সুখ্যাত ও সর্বাধিক শক্তিশালী অধস্তন পুরুষ, খোরসানের অধিপতি সুলতান হুসেন বৈকারা শেইবানীর বিরুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করার জন্যে বাবরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাবর সানন্দে এবং সাগ্রহে গিয়ে পৌঁছলেন হেরাতে। কুড়িটি বড়ো আনন্দময় দিন তিনি সেখানে কাটালেন। প্রতি-দিন ঘোড়ায় চড়ে নতুন নতুন জায়গা ভ্রমণ করে আসেন। কোনোদিন যান কোনো গুলবাগিচায়, কোনোদিন বা কোনো সমাধিস্থলে ; কোনোদিন কোনো মসজিদে, কোনোদিন বা হাসপাতালে এবং সর্বত্র। দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সারা পৃথিবীতে এমন বাসযোগ্য স্থান বুঝি আর নেই।

কিন্তু বাবর সাহায্য করতে এলেও হেরাত হাতছাড়া হয়ে গেল। সুলতানের কাছ থেকে চলে গেল শেইবানীর অধিকারে। পালিয়ে গেলেন সুলতান হুসেনের ছেলেরা। বাবর তখন কান্দাহারের দিকে এগিয়ে গেলেন বিলাসব্যসন ছেড়ে। গুলবাগিচায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখা পেয়েছিলেন মাহমের। সুন্দরী মাহমের। এই কুড়িদিনের স্বর্ণমুহূর্তের কতক্ষণই না বন্দী হয়ে গেছিল মাহম-বাবরের প্রণয় গুঞ্জনে। বাবর জানলেন মাহমকেও পালিয়ে যেতে হয়েছে পরিবারের অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে। অমনি তিনিও সসৈন্যে এগোলেন। কান্দাহারের পথে যেতে যেতে তাঁর দেখা হয়ে গেল প্রস্তুত সৈন্যদলের সঙ্গে। আর দেখা হল সুলতান পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে। সেখানে রয়েছেন মাহম। তাঁর তখনকার যৌবনের স্বপ্ন, তাঁর প্রিয়তমা মাহম। কর্তব্য আর প্রেমের দ্বন্দ্বে তখন কর্তব্য প্রধান স্থান পেল বটে, মন পড়ে রইল মাহমের কাছেই। গুলরুখের কথা হয়তো একবার মনে এসেছিল, কিন্তু মাহমই তখন কেড়ে নিয়েছে তার দিনের কাজ, রাতের ঘুম। কর্তব্য পালনের আগেই তাই মাহমকে

তিনি বিবাহ করলেন। সেটা ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ। বাবর তখন ২১ বছরের টগবগে তরুণ।

বিয়ের কিছুদিন পরেই বাবর-মাহমের সন্তানেরা একে একে জন্মগ্রহণ করতে লাগল। প্রথমা পত্নী আয়শার কন্যাসন্তান জন্মেই কিছুদিন পর মারা গেছে। শেষে জন্ম হল মাহমের গর্ভে সুলতান বাবরের প্রথম পুত্র-সন্তান হুমায়ুনের! হুমায়ুন মাহমের একমাত্র জীবিত সন্তান। অনেকগুলো ছেলে মরে তবে হুমায়ুন। সেজন্যে মায়ের নয়নের নিধি। তাঁর কোল আলো করে এসেছিল আরও চারটি সন্তান। এলো বারবুল মীর্জা, এলো মিহর-জান বেগম। এলো ইসান দৌলত বেগম আর ফারুক মীর্জা। সবাই বড়ো স্বল্পায়ু। ফারুক মীর্জা পুরো দুটো বছরও বাঁচে নি। তাকে তো তাঁর পিতা দেখার সুযোগ পর্যন্ত পান নি।

সবশেষে কেবল বেঁচে রইলেন হুমায়ুন। তাঁর জন্ম হয়েছিল কাবুল দুর্গে। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, রাত্রি ৯১৩ হিজরী সনের ৪ঠা জুল-কেদা, ইংরেজি ৬ মার্চ ১৫০৮ খৃস্টাব্দ। সূর্য তখন মীন রাশিতে। এই হুমায়ুন, 'সৌভাগ্য'-কে নিয়েই মাহমের বাকী জীবন কেটেছে। তা বলে তাঁর সপত্নী পুত্র-কন্যারা তাঁর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হন নি কেউ। হিন্দালকে তো তিনি পোষ্যপুত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। গুলবদনও ছিলেন তাঁর পালিতা কন্যা। অনেক বড়ো হয়েই তাঁরা আপন মা দিলদারকে কাছে পেয়েছিলেন। কিন্তু ছোটবেলায় তাঁরা কোনোদিনই বুঝতে পারেন নি মাহম তাঁদের গর্ভধারিণী মা নন।

সংসারে দেখা যায়, যাঁরা ভাল তাঁরাই বেশি দুঃখ পান। মাহম বাবরের প্রিয়তমা মহিষী হলেও দুঃখী ছিলেন। পাঁচ সন্তানের জননী হয়েও চার চারটি সন্তানকে তিনি হারিয়ে ছিলেন অকালে। একটি মাত্র নিধি যিনি মোগল বংশের দ্বিতীয় সম্রাটরূপে অভিষিক্ত তাঁকে নিয়েও তাঁর গর্ব করার, আনন্দ করার দিনগুলোও বুঝি নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল। মীর্জা হুমায়ুন শাসনভার গ্রহণের জন্য বদকশান গেছেন। মা মাহমও সঙ্গে গেছেন রক্ষাকবচ হয়ে। তেরো বছরের কিশোরটিকে একলা ছেড়ে দিতে তিনি একেবারেই নারাজ। তা বলে স্বামীর দিকে তাঁর নজর কম ছিল ভাবাই

যায় না। একটু বেশিই ছিল বুঝি। আর তাই নিয়ে স্বামীর কাছে বকুনিও খেয়েছেন।

তখন বাবর প্রায় চার বছর ধরে আগ্রায় রয়েছেন। একদিন প্রখর গ্রীষ্মে একটা মজার ব্যাপার ঘটল। বাবর প্রতি শুক্রবারই হিসেব করে নিজের পিসিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। একদিন খুব গরম বাতাস বইছে। তাই দেখে মাহম স্বামীকে ডেকে বললেন—'আজ প্রিয়তম, তোমাকে বাইরে যেতে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। বাইরে একদম লু বইছে। নাই বা গেলে তোমার পিসিদের সঙ্গে এ শুক্রবার দেখা করতে। বেগমরা নিশ্চয়ই তাতে কিছু মনে করবেন না।'

শুনে বাবর দুঃখ পেলেন। বললেন—'প্রিয়তমা, তুমি কি করে এমন কথা বলতে পারলে? আশ্চর্য! আবু সঈদ মীর্জার মেয়েরা আজ পিতৃ হারা, ভাই হারা। আমি ছাড়া আর তাদের কে আছে যে তাদের মুখে হাসি ফোটাবে?'

না, তা বলে বাবর রাগ করে থাকতে পারেন নি কোনদিন। মাহমকে তিনি ভালবাসতেন নিজের চেয়েও বুঝি বেশি। একবার মাহম আসছেন কাবুল থেকে হিন্দুস্তানে। মাহম যখন আলিগড়ে (কূল-জলালী) পৌঁছলেন তখন তিনজন অশ্বারোহী এল দুটি চতুর্দোলা নিয়ে। সম্রাট বাবর তাঁর স্ত্রীর আগমনকে স্বচ্ছন্দ করার জন্যই চৌদোলা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাহম ধীরে ধীরে আসছেন, সম্রাট যেন ধৈর্য ধরতে রাজী নন। দ্রুতগতিতে চৌদোলা চড়ে মহিষী এগিয়ে আসছেন। বাবরের ইচ্ছা তিনিও আলিগড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মিলিত হবেন তাঁর প্রিয়তমা ভার্যার সঙ্গে। তার আগেই খবর পেলেন মাহম এসে গেছেন মাইল চারেক দূরত্বের মধ্যে।

বাবরের আর প্রার্থনা সারা হল না। ঘোড়া আনানোর সময়টুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তাঁর উন্মুখ মন নারাজ। পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পথে রাত হলে যে শিবিরে নামবার কথা তার একটু আগেই সম্রাট দেখতে পেলেন তাঁর মাহমের চৌদোলা আসছে। মহিষী তাঁকে দেখতে পেয়েই দোলা থামিয়ে তা থেকে নেমে আসার উদ্যোগ

করতে লাগলেন। বাবরের তখন তুঙ্গ অবস্থা। প্রেম-কামনার আবেগে তিনি ভিতরে ভিতরে কাঁপছেন থর থর করে। সৌজন্য-শিষ্টাচার গেলেন ভুলে। ভুলে গেলেন পরিবেশ এবং বাহকদের কথা। অধীর আগ্রহে তিনি নিজেই দোলা থামিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। আদরে আদরে প্রিয়তমা বেগমকে পূর্ণ করে ভরিয়ে দিয়ে নেমে এলেন দুজনে। তারপর বাকী পথ দুজনে পায়ে হেঁটে হাতে হাত ধরে এগিয়ে গেলেন সম্রাট মহলের দিকে।

কখনও বা বেড়াতে গেছেন স্বামীর সঙ্গে ধোলপুরের বাগানে। এখানের এক অখণ্ড পাথর খুঁড়ে দশ গজ লম্বা-চওড়া একটা ছোট পুকুর বানিয়ে রেখেছেন বাবর। তার পাড়ে বসে মাহমের সঙ্গে রচনা করেন সুখ-দুঃখের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু এসব সুখ মাহমের জীবনে শুধুমাত্র নিশার স্বপনের মতই এসেছিল। অচিরে এসে গেছিল দুঃখের অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনাদায়ক মুহূর্তগুলি। সম্রাট বেগমদের নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ধোলপুরের দিকে নৌকাযোগে। হঠাৎ দিল্লী থেকে মৌলানা মহম্মদ ফরঘরীর চিঠি এল : মীর্জা হুমায়ুন প্রবল অসুস্থ। অবস্থা সঙ্কটজনক। মহামান্যা বেগম যেন অবিলম্বে দিল্লী চলে আসেন। হুমায়ুন মীর্জা দারুণ ভেঙে পড়েছেন।

মাহম ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। পাগলের মতো দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। হলেনই বা সম্রাটের বেগম। তিনি যে মা, অনেক ছেলে মরা এক সন্তানের মা। আর্তের মতো ছুটে গেলেন তিনি দিল্লীর দিকে। পথে মথুরাতেই দেখা হয়ে গেল হুমায়ুনের সঙ্গে। বাবর জলপথে হুমায়ুনকে দিল্লী থেকে আগ্রায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছেন।

ছেলেকে দেখেই মা বুঝতে পারলেন হুমায়ুন খুবই রোগা আর কাহিল হয়ে পড়েছেন। চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে হুমায়ুন আরও প্রবল অসুস্থ। বুকের ডানায় আগলে শাবকের মতো হুমায়ুনকে নিয়ে এলেন আগ্রায়। তারপর চলতে লাগল বিনিদ্র সেবা। সেবা আর প্রার্থনা। তবুও হুমায়ুন প্রতিদিনই যেন ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলেন। প্রতিদিনই আরও বলহীন। কখনও চেতনা পান, কখনো চেতনা হারান।

মাহম উন্মাদপ্রায়।

সম্রাট বাবর পুত্রকে দেখতে এসে পত্নীকে দেখে উদাস। এই সংসার! এই ভালবাসা! এমনি করেই তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে! মুখে হা-হুতাশ নেই। কিন্তু অন্তরটা শূন্য, শুষ্ক। তাঁর চোখ দুটিকে ক্রমে গ্রাস করল বিষণ্ণতা, মুখশ্রীকে আচ্ছন্ন করল প্রবল কারুণ্য। মহিষী একবার পুত্রের দিকে তাকান। আর একবার স্বামীর দিকে। দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

একদিন মাহম বাবরের হাত দুটোকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কেন, কেন তুমি এতো ভেঙে পড়েছো। তুমি তো রাজা, তুমি তো সম্রাট। তুমি কেন এত দুঃখ পাবে? আর তোমার তো এই একটি মাত্র ছেলে নয়, তোমার তো আরও ছেলে আছে। যদি বল আমি কাঁদছি কেন? আমি তো কাঁদবই। এই একটি মাত্র অন্ধের নড়ি আল্লাহ্‌ আমাকে দিয়েছেন। এ চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচব।

বাবরের স্বর গভীর হয়ে উঠল। মাহমকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ মাহম। আমার আরও অনেক সন্তান আছে। কিন্তু তারা কি কেউ আমার হুমায়ুনের চেয়ে বেশি প্রিয়? তাকেই যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। এমন কি আমার প্রাণের চেয়েও। আমার সব নিয়ে ও বেঁচে থাকুক—এই আমার প্রার্থনা। আমি চাই ও-ই আমার রাজ্যের পরবর্তী অধিকারী হোক। ওর মতো সন্তান, কি গুণে, কি প্রতিভায় আমার একটি সন্তানও নয়।

একটা গভীর বিষাদ বাবরের অন্তরকে বেশ কিছুদিন ধরেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

হুমায়ুনের অসুস্থতার আগেই একদিন বাগ-ই-বার আফশানে এক প্রমোদভ্রমণের আয়োজন করেছিলেন সম্রাট বাবর। বাগানের মধ্যে ছিল একটি চৌবাচ্চার মতো জায়গা—নমাজের আগে হাতমুখ ধোবার জন্যে। সেটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে আপন মনেই বলে উঠেছিলেন—'মহিষী আর যেন পারছি না। রাজত্ব আর শাসন কার্য পরিচালনা করে বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি বেগম। এখন কেবল ইচ্ছে হচ্ছে

জীবনের সব কাজ থেকে অবসর নিয়ে শুধু এই বাগানটাতে একা একা থাকি। পরিচারক হিসেবে শুধু আমার কাছে থাকবে আমার জলপাত্র বাহক তাহির। রাজ্যের ভার তুলে দেব পুত্র হুমায়ুনের হাতে।'

শুনে চোখে জল এসে গেছিল দুঃখী মাহমের। তাঁর ভালবাসার মধ্যেও কি তবে সম্রাটের কোনো সুখ নেই। দেহ শুধু কাছে এসে তাঁর হৃদয়কে ক্লান্ত করছে? এক চোখ জল নিয়ে মাহম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘকাল সুখে শান্তিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখুন। আর আপনার সেই দীর্ঘ পরমায়ুর অধিকারী হয় যেন আপনার সব পুত্রই।

হুমায়ুন অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই একই অবসাদ সম্রাটের মধ্যে এলেও পুত্রপ্রেমে সমৃদ্ধ পিতা বাবর যেন আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন। এবং তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠল ইতিহাসের সেই প্রখ্যাত কিংবদন্তী। এর পর বাবর হুমায়ুনের শয্যার পাশে তিনবার ঘুরে নিজের পরমায়ুর পরিবর্তে পুত্রের পরমায়ু প্রার্থনা করলেন এবং নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

অসুস্থতার মধ্যেও সম্রাট মাহমকে কাছে ডেকে বলেন—মহিষী আমার দিন শেষ হয়ে গেছে। গুলরঙ-আর গুল-চিহরা তো তোমারই মেয়ে। গুলবদনটা খুবই ছোট। ওর কথা এখন ভাবি নে। তুমি বড় দুটোর সাদীর যাহোক ব্যবস্থা কর। ওদের পিসি, আমার দিদি (খানজাদা বেগম) এলে তাঁকে বলো যে ইসান তৈমূর সুলতানদের (ইসান হলেন বাবরের মৃত ছোট মামা আহমদ খানের পুত্র) সঙ্গে গুলরঙের এবং তূখ্‌তা-বুখার সঙ্গে গুলচিহরার বিয়ে দিতে আমার খুব ইচ্ছে। সে যেন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়।

তারপর ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ সোমবার বাবর চলে গেলেন চিরদিনের জন্য। মাহম কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কিন্তু তাঁকে শান্ত হতে হল। ভবিষ্যৎ সম্রাটের তিনি মা। বাবর যে তাঁকে কত ভালবাসতেন তার একটা প্রমাণও পেয়ে গেলেন তিনি তাঁর মৃত্যুর পরেও। নতুন সম্রাট হিসেবে হুমায়ুনের অভিষেকের পর

যিনি তাঁর তত্ত্বাবধায়ক রূপে নির্বাচিত হলেন তিনি হুমায়ুনের মাতুল এবং মাহম বেগমের ভাই মহম্মদ আলী অসজ।

বাবর, তাঁর প্রিয়তম স্বামী চলে গেছেন। প্রতিদিন সমাধিসৌধে চলে প্রার্থনা। মাহম নিজে দৈনিক দুবার ভোজন ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় খরচ-খরচা দিতে লাগলেন। আমৃত্যু এই ব্রত তিনি স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য পালন করে গেছেন।

গুলচিহরা আর গুল-রঙের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবর থাকতেই হুমায়ুনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। হুমায়ুনের পুত্রও হয়েছিল। পুত্রের আরও সন্তানের জন্য তিনি উন্মুখ থাকতেন। এমনকি এ জন্য পুত্রের শয্যাসঙ্গিনী নির্বাচনেও উদ্‌গ্রীব থাকতেন। সামান্য এক পরিচারিকা মেওয়া-জান দেখতে সুন্দর ছিল। মায়ের আদেশে হুমায়ুন তাকে বিয়ে করলেন। কোনো বধূ গর্ভবতী জানলে দারুণ খুশি হতেন মাহম। তাঁর স্নেহপ্রস্রবণ সর্বদা স্নেহপাত্রের দিকে ছিল সদাধাবমান। হুমায়ুনকে ঘিরেই তখন তাঁর স্বপ্নজাল বিস্তৃত। পুত্রের আরোগ্যে তিনি সুখী। পুত্রের গৌরবে গর্বিত। হুমায়ুন চুনার থেকে নিরাপদে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন। অমনি মাহম বেগম বিরাট ভোজের আয়োজন করে বসলেন। চারিদিক সাজসজ্জার আদেশ দিলেন। অমন আলোকসজ্জা আগ্রায় এর আগে দেখা যায় নি।

পুত্রের জন্যে তৈরি করিয়েছেন রত্নখচিত সিংহাসন। তার মাথার ওপরে সোনার সূতোর সূক্ষ্ম কারুকার্যসমন্বিত চন্দ্রাতপ। এমনকি গদি বালিশগুলোতে পর্যন্ত সোনার সুতোর কাজ।

এছাড়া তৈরি করিয়েছিলেন গুজরাটী সোনার কাপড় দিয়ে আরও একটি চন্দ্রাতপ। তৈরি করিয়েছিলেন একটি করে কন্নৎ ও সর-কন্নৎ। গড়িয়েছিলেন গোলাপজলের ঝারি। গড়িয়েছিলেন দীপাধার। সবই সোনার তৈরি আর মণিমুক্তোহীরেজহরৎ বসানো।

কিন্তু হুমায়ুনের জীবনে স্বস্তি ছিল না। তাই একদিন মাকে এসে বললেন—মাগো আর ভালো লাগে না এই যুদ্ধ আর পালিয়ে বেড়ানো। চল না ক'দিন বেড়িয়ে আসি গোয়ালিয়র থেকে। তাই

যাওয়া হল। অনেককে নিয়ে মাহম গেলেন সেখানে। বেগাবেগম আর আকীকা কাছে ছিলেন না বলে তাঁদের জন্যে মন খারাপ করতে লাগলেন। আনিয়ে নিলেন তাঁদের। বিশাল উদার হৃদয় তাঁর, তাই বিশ্বজোড়া ভালবাসা। দু মাস ধরে সবাই একসঙ্গে গোয়ালিয়র থেকে ফিরলেন এবার আগ্রায়। সেটা ১৫৩৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। হিজরী ৯৩৯ সনের শবান মাস।

এর পরেই শওয়াল মাসে একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মাহম। স্বামীর মতই পেটের গোলমাল দেখা দিল। আর বেশিদিন ভুগতে হল না এই দুঃখী আর গর্বিতা সম্রাজ্ঞীকে। ১৩ শওয়াল ৯৩৯ হিজরী, ৮ মে ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি চিরবিদায় নিলেন। মোগল সম্রাটের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বাবরের অন্দর মহলের সবচেয়ে উজ্জ্বল চেরাগটি নিভে গেল। শুধু শোকের জন্যে রইলেন বাবরের সন্তানেরা। বিশেষ করে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেলেন তাঁর পালিতা কন্যা গুলবদন মাহমের অন্দর-মহলে থেকেই। হারানোর ব্যথা কি সহজে ভোলা যায়!

বাবর-কন্যা গুলবদন

ওমর সেখ মির্জার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দে। তার নামকরণ করা হয়েছিল জহীর-উদ্-দীন মোহম্মদ। বড্ড কঠিন লাগে উচ্চারণ করতে। তাই নামকরণ করা হয়েছিল চিতাবাঘের মতো তার বিক্রমকে স্মরণ করেই বুঝি—বাবর। পিতার মতই বড় হয়ে বাবর অনেকগুলি পত্নীকে হারেমে স্থান দেন। এঁদেরই একজন ছিলেন দিলদার অগাচহ্ বেগম। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দুর্ধর্ষ বীর সুলতান বাবরের পাঁচ সন্তানের গর্ভধারিণী। প্রথম সন্তান ছিলেন কন্যা—নামটি চমৎকার গুলরঙ। জন্মেছিলেন ১৫১১ থেকে ১৫১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। তাই থেকে ধরে নিতে পারি ১৫১০ খৃস্টাব্দ নাগাদ দিলদার এসেছিলেন বাবরের হারেমে। দিলদারের গর্ভে এর পরে যে সন্তানটি জন্মগ্রহণ করে ভূমিষ্ঠ হল—সেটিও কন্যা। এর নামটিও বেশ মনোরম—গুলচিহ্রা। তৃতীয়

সন্তানের পিতৃদত্ত নাম আবু নাসির হলেও ইতিহাসে তাঁর পরিচিতি একটি দারুণ সুন্দর নামে—হিন্দাল নামেই। হিন্দাল না হিন্দোল! এমন একটি পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী যদি মোগল রাজবংশে একজনকেও পেতাম, বর্তে যেতো তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাস। পঞ্চম বা শেষ সন্তান আলওয়ার (অকাল মৃত্যু ১৫২৯ খৃষ্টাব্দেই) জন্মাবার আগেই দিলদারের গর্ভে জন্মেছিলেন মোগল রাজবংশের বিদূষীদের অন্যতম গুলবদন, সম্ভবত ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলে, হিন্দুস্তানের বাইরে।

হিন্দাল জন্মেছিলেন ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে। সেদিক থেকে তাঁর এই প্রিয়তমা ভগিনীটি তাঁর থেকে বছর চারেকের ছোটো। কি ভালোটাই না বাসতেন তাঁর এই ছোট্ট বোনটিকে। আর বোনটিও দাদা বলতে অজ্ঞান। হিন্দাল তো মায়ের পেটের ভাই, ভালোবাসারই কথা। বৈমাত্রেয় ভাই হুমায়ুনই কি কম ভালবাসতেন এই ছোট বোনটিকে! হুমায়ুন ছিলেন বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র—তাঁর প্রধানা মহিষী মাহম বেগমের প্রথম সন্তান। হুমায়ুন (জন্ম ৬ মার্চ ১৫০৮) গুলবদনের চেয়ে বয়সে প্রায় পনেরো বছরের বড়ো। তাঁর ভালবাসা ছিলো অনেকটা বাবার মতোই।

বাবর তনয়া, হুমায়ুন ভগিনী গুলবদন ছিলেন অবশ্যই মহামতি আকবরের পিসিমাও। পিতা বাবর যখন মারা যান গুলবদনের বয়স তখন বছর সাতেক কি আটেক (বাবরের মৃত্যু ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ)। হুমায়ুনের মৃত্যু হয় ২৬ জানুয়ারি ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে—গুলবদন তখন তেত্রিশ বছরের মধ্যবয়স্কা রমণী, আকবর তখন মাত্র ১৪ বছরের বালক (জন্ম ২৩ নভেম্বের ১৫৪২)। আর গুলবদন যখন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন (১৬০৩ খ্রী) তখন তিনি নিজে আশী বছরের পূর্ণ পরিণত বয়স্কা মহিলা আর সম্রাট আকবর নিজে ৬১ বছরের পরিণত শাসক।

আকবরের মৃত্যু হয় পিসিমার মৃত্যুর দু বছর পরেই (১৭ অক্টোবর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ)। ইতিহাসকারেরা লিখেছেন যুবরাজ সলীমের বিদ্রোহ আর প্রিয়বন্ধু আবুল ফজলের শোচনীয় মৃত্যু তাঁকে হেনেছিল মর্মান্তিক

আঘাত। আর দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়েলের অকালমৃত্যু তাঁর স্বাস্থ্যের সুঠাম কাঠামোটিকে দিয়েছিল একেবারে চুরমার করে। তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল সহসা পীড়া এসে তাঁকে বিপর্যস্ত ক'রে। যদি একথাও বলি যে তাঁর অভিজাত পিতৃস্বসার মৃত্যুর বেদনাও তাঁর মৃত্যুকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল, তবে কি তা ইতিহাসের তথ্যের বিরোধী হবে? পিতা বাবর, বৈমাত্রেয় ভাই হুমায়ুন, ভ্রাতুষ্পুত্র আকবর—তিন সম্রাটের জীবনের সূচনা ও স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও বিপর্যয় সুখ ও দুঃখের তিনপুরুষের ভাগী ও সাক্ষী গুলবদনের জীবনে তাই জমেছিল অজস্র অভিজ্ঞতার স্তূপমণ্ডলী। তাঁর শিক্ষিত মন সেই অভিজ্ঞতাকে উপহার দিয়েছে তাঁর আত্মস্মৃতির আকারে। এই আত্মস্মৃতিতে যেমন প্রকাশিত হয়েছে একটি ধর্মনিষ্ঠ রাজকীয় মহিলার ঈশ্বরানুরক্তি, যেমন মুদ্রিত হয়েছে অন্তঃপুরচারিণীর প্রবল কর্মোদ্যোগ, তেমনি সুরভিত হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তঃকরণের স্নেহ-মিশ্রিত সৌরভ।

শুধু তাই নয় তাঁর 'হুমায়ুননামা' আত্মস্মৃতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বাবর-হুমায়ুন-আকবরের রাজ্যশাসনের, মোগল অন্তঃপুরের এবং সমসাময়িক ঘটনাও বিশ্বাসের দলিলচিত্র হয়ে উঠেছে। অন্দরমহলের কেচ্ছাকাহিনী নয়। হুমায়ুননামা সত্যনিষ্ঠ এক ইতিহাস, মোগল ইতিহাসের আদি পর্বের বিশ্বাসযোগ্য আকরগ্রন্থ। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'হুমায়ুননামা'র পাণ্ডুলিপি (Or. 116) সযত্নে রক্ষিত হয়ে আজও তিনপুরুষের লিপিসাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আবুল ফজল তো গুলবদনের কাছেই নানা কাহিনী শুনে তাঁর সুখ্যাত আইন-ই-আকবরীর বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

হুমায়ুন ছিলেন মাহম বেগমের একমাত্র জীবিত পুত্র। শুধু পুত্র নন, একমাত্র সন্তানও। তাঁর গর্ভজাত অন্য সব সন্তানই অকালে মারা যায়। স্বভাবতই হুমায়ুন সেজন্যে ছিলেন বাবরের চোখের মণি। একবার পাটরাণী মাহমকে তিনি বলেই বসেছিলেন—কেন দুঃখ করছ রাণী, আমার আরও অনেক ছেলে আছে বটে, কিন্তু হুমায়ুনের চেয়ে কি আমি আর কাউকে বেশি ভালবাসি? সে যে আমার চোখের মণি!

হুমায়ুন যদি একরোখা হয়ে অন্য ভাইবোনদের হিংসে করতেন, খুব একটা অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু গুলবদন আর হিন্দাল সম্পর্কে তাঁর একটা দুর্বল ক্ষেত্র ছিল। কামরান বা অস্করীও তো তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের কি এঁদের মতো এতোখানি ভালবাসতেন হুমায়ুন? কখনোই না। বিশেষ করে কামরানকে তো কখনোই নয়। ভালবাসার কথাও নয়। কামরান কি তাঁর কম বিরোধিতা করেছেন?

কিন্তু হিন্দাল বা গুলবদনকে ভালবাসার অন্য একটা কারণও ছিল। মৃতবৎসা মাহমের বুকে মাতৃস্নেহের অজস্র উৎসার। এক হুমায়ুনকে ভালবেসে তার পরিসমাপ্তি ঘটে না। সপত্নী দিলদারের সন্তানেরা তখন একের পর এক জন্মগ্রহণ করে চলেছে। না, কোন ঈর্ষার জ্বালা মাহমকে ধরাশায়ী করে না। প্রবল মাতৃত্বে তিনি দিলদারের পুত্র-কন্যাদের কাছে টেনে বুকের মধ্যে বেঁধে রাখেন। সবচেয়ে ভাল লাগে তাঁর হিন্দালকে আর গুলবদনকে। তবুও তাঁর একটা পুত্রসন্তান আছে। কিন্তু মেয়ে না হলে কি বুকের স্নেহ পরিতৃপ্ত হয়! মেয়ে তো নিজেরই প্রতিরূপ। তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, তাকে পরিয়ে-খাইয়ে, তাকে নাইয়ে-চুল বেঁধে তো নিজের হারানো জীবনটাকেই সাজিয়ে গুজিয়ে তোলা হয়। তাঁর শৈশবেই গুলবদনকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। দিলদার আপত্তি করেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবরেরও যে সেই ইচ্ছে। তাই মায়ের পেটের ভাইবোনের মতোই হুমায়ুন আর গুলবদন বেড়ে উঠেছিলেন। হুমায়ুন তো তখন বড়োই হয়ে উঠেছেন। গুলবদন, শিশু গুলবদন মাহমের পীযূষ ধারায় স্নাত-পরিতৃপ্ত হতে থাকলেন।

কিন্তু পুত্র-কন্যাদের ভালবেসে সাধারণ মানুষের মতো নিরাপদ-নিশ্চিন্তে দিনযাপনের অবকাশ কোথায় বাবরের? দিগ্বিজয় তখন তাঁর রক্তে ধরিয়েছে দারুণ নেশা। মাত্র পনের বছর বয়সে যিনি সমরখন্দ অধিকার করেন, চল্লিশ বছর বয়সে আক্রমণ করেন ভারতের সীমান্ত অঞ্চল আর তেতাল্লিশ বছরে পাঞ্জাব আক্রমণ করে দৌলত খাঁকে বশে আনেন, বিজয় গৌরবে দিল্লী আর আগ্রাকে অধিকার করেন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে, পঁয়ত্রিশ বছরে জয়লাভ করেন খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭ খৃষ্টাব্দ).

তাঁর কি পুত্র-কন্যাদের আদর করে ঘরের কোণে দিন কাটাতে পারে ?

তবুও অন্তরে তাঁর পত্নীর জন্য যেমন ছিল ভালবাসা, তেমনি পুত্র-কন্যাদের জন্যও স্নেহ ভালবাসা ছিল বইকি ! স্বামী বাবরের একের পর এক জয়ের সংবাদে মাহম আত্মহারা হয়ে কাবুল থেকে ছুটে এলেন আলিগড়ে, সঙ্গে বুকে করে এনেছেন ছয় বছরের ছোট্ট আর ফুটফুটে গুলবদনকে। বাবর এগিয়ে গেছেন তখন আরও একটু দূরে আগ্রায়। ২৭ জুন ১৫২৯ খৃষ্টাব্দের রাত যখন নিষুতি হয়ে উঠেছে, মাহম-বাবরের মিলন হল তখন। বেশ রাত হয়ে গেছে আলিগড় থেকে আসতে। অতএব মাহম ইচ্ছে সত্ত্বেও গুলবদনকে নিয়ে আসতে পারেন নি আলিগড় থেকে আগ্রায়। গুলবদন আগ্রাতেই রয়ে গেছে জেনে বাবরের পিতৃহৃদয়, বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় যেন হতাশায় কেঁদে উঠল। পরের দিন ভোর না হতেই পিতার সঙ্গে কন্যার মিলনকে তরান্বিত করার জন্য বাবর লোক পাঠিয়ে দিলেন। ছোট্ট গুলবদন এসে বাবাকে দেখে বাবার পায়ে পরম শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে লুটিয়ে পড়ল। গুলবদনের বাবা তো আর পাঁচটা মেয়ের বাবার মতো নন, তিনি দিগ্বিজয়ী বীর বাবর। পিতা বাবর তখন পরম স্নেহে গুলবদনকে বুকে তুলে নিয়ে অজস্র চুমোয় ভরিয়ে দিলেন গুলের বদন। ছোট্ট বেলার সেই স্মৃতি গুলবদনের অন্তরে চিরস্থায়ী মুদ্রিত হয়ে গেছিল। সেদিনের সেকথা স্মরণ করেই বড় হয়ে 'হুমায়ুন-নামা'তে গুলবদন উজ্জ্বল করে, গৌরব করে লিখেছিলেন—'বাবার বুকের মধ্যে আটকে থেকে আমি যে কি অপার নির্মল আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম, জীবনে তার চেয়ে বেশি আনন্দের অনুভূতি বুঝি কল্পনাতীত।'

ভিতরে ভিতরে বোধহয় বাবর বুঝতে পারছিলেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। জীবনের আস্বাদকে তাই তিনি বুঝি চাইছিলেন পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিতে। তাই না চাইলেন মাহমকে নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দিতে, না চাইলেন গুলবদনকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিছুদিন পর তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন সৌন্দর্যনগরী ঢোলপুর আর সিক্রিতে। সিক্রির বাগানে সকলে মিলে গড়ে তুলেছিলেন একটি

চৌখণ্ডী—বাবর এটিকেই একটি তূর্খানা করে এর উপরে বসে তাঁর আত্মজীবনী 'বাবুরনামা' রচনা করতেন (বাবরের আত্মজীবনী তুজক্-ই-বাবুরী এবং ওয়াকি'-য়াৎ-ই-বাবুরী নামেও পরিচিত)।

এই সিক্রির বাগানের এক নির্জন কোণে বসে মা মাহম একনিষ্ঠ মনে নিরত হতেন আল্লাহ্-এর উপাসনায়। বাবরের অপর এক পত্নী ছিলেন মুবারিকা। নিঃসন্তান মুবারিকাও এসেছিলেন মাহমের সঙ্গে এই সিক্রির বাগানে। মাহম প্রায়ই ভগবৎ-উপাসনায় নিমগ্ন থাকতেন আর ছোট্ট গুলবদনকে সে সময়ে দেখাশোনা করতেন মুবারিকা। একদিন একটা ঘটনার কথা গুলবদন স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তাঁর 'হুমায়ুন-নামা'য় উল্লেখ করে দিয়েছেন। মুবারিকা আর গুলবদন খেলা করছিলেন। গুল একটু অশান্ত। তাকে টেনে ধরে আনতে গিয়েছিলেন মুবারিকা। হতভাগিনীর টানটা একটু বেশি জোরেই হয়ে গিয়েছিল। একটা বড়ো মানুষের হাতের জোরে কি ছোট্ট মেয়ে পারে? টানাটানিতে ছোট্ট গুলের হাড় গেল স'রে। খুব জোরে কেঁদে উঠেছিল গুলবদন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হল চিকিৎসককে। তিনি এসে মশলা আর আরক দিয়ে বেঁধে দিলেন। ভাঙা হাড় জোড়া লাগল অনতিবিলম্বে। খবরটা বাবরের কানে গেল। অস্থির হয়ে ছুটে এলেন তিনি। কোলে তুলে নিলেন আদরের মেয়েটিকে ; মেয়েকে দেখে তবে স্বস্তি পেলেন।

কিন্তু গুলবদনের ভাগ্যে পিতার এমন নিঃসপত্ন আদর বুঝি বেশি দিনের জন্য লেখা ছিল না। হুমায়ুন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সম্ভল জয় করতে গিয়ে নিদারুণ গ্রীষ্মের খরতাপে। দিল্লীতে এসেই তাঁর অবস্থা এতো সঙ্গীন হল যে আগ্রা পর্যন্ত তাঁকে আনা যাচ্ছিল না। শেষ অবধি তিনি আগ্রায় এলেন। গুলবদন, তাঁর বোনেরা হুমায়ুনকে দেখে একেবারে কাতর হয়ে গেলেন। বাবরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হুমায়ুন যেন একেবারে প্রলাপ বকছেন। তারপর সেই বহু পরিচিত উপাখ্যান। ঈশ্বরের কাছে বাবরের প্রার্থনা—আমার আয়ু নিয়ে তুমি আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে দিও। উপাখ্যান বলে—হুমায়ুন বেঁচে উঠলেন, বাবর শুলেন মৃত্যুশয্যায়। শুনতে ভাল লাগে এই ঈশ্বর বিশ্বাসের মনোরম কাহিনী।

14665

কিন্তু ঘটনা তা নয়। গুলবদন স্বয়ং তার সাক্ষী। তিনি লিখেছেন, সেদিনই বাবর অসুস্থ হয়ে শুলেন বটে, কিন্তু তিনি আরও লিখেছেন যে বাবর অনেক আগে থেকেই হতাশায় ভুগছিলেন। তাঁর মনের জোর তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বাবরের মৃত্যু হয় নি। ভাল হয়ে হুমায়ুন আগ্রা ছেড়ে পুনশ্চ সম্ভলে যান বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আর উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই জেনেই। দু'তিন মাস ভোগার পর হঠাৎ তাঁর অবনতি ঘটে এবং হুমায়ুনকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তারপর বাবরের মৃত্যু ঘটে। বাবরের মৃত্যু স্বভাবতই গুলবদনের জীবনে শূন্যতা আনল। সাত বছরের মেয়ে নিশ্চয়ই সেই 'ফিরদৌস মকানী' দুঃখস্মৃতি ভুলে যান নি, যেতে পারেন নি।

দুঃসময় একা আসে না কখনও। গুলবদনের জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রশ্রয় পায় নি। পিতার মৃত্যুর ক্ষত তখনও তাঁর অন্তর থেকে শুকোয়নি। তাঁর কাছে এসে পড়ল আরও একটি তীব্র অপ্রার্থিত আঘাত। বীবনের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে হুমায়ুন আগ্রায় এসে মা মাহমের কাছে আছেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস তখন। মাহমের পেটে এক দারুণ পীড়া দেখা দিল—তিনি চলে গেলেন তাঁর প্রিয় স্বামীর সন্নিধানে (১৫৩৩ খৃঃ)। দশ বছরের গুলবদন, অনাথা গুলবদন কান্নায় ভেঙে পড়লেন একেবারে। ক্রমাগত কেঁদে চলেন, কিছুতেই পারেন না মনকে প্রবোধ মানাতে। নিজেকে ভাবেন এক আশ্রয়হীনা আতুর বালিকা বলে। তাঁর প্রিয় আকাম্-ও তাঁকে এভাবে ছেড়ে চলে যাবেন —মাত্র দশ বছরের বালিকা স্বপ্নেও ভাবে নি।

নিরাশ্রয় গুলবদনকে অতএব ফিরতে হল গর্ভধারিণী দিলদারের স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের চিরবাঞ্ছিত আশ্রয়ের মধ্যেই। শুধু গুল একা নয়, অগ্রজ হিন্দালকেও বুকে তুলে নিলেন দিলদার। এতোদিনে দিল তাঁর পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি তো এতোদিন ওদের প্রসব করেই ছিলেন—পালন তো করতে পারেন নি। অভিমানে প্রথমে নিশ্চয়ই ফুলে উঠেছিল তাঁর শুষ্ক ওষ্ঠাধর। তিনি মা, কতক্ষণই বা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন। অচিরে টেনে নিয়েছিলেন পুত্র কন্যা দুটিকে শূন্য বুকের পিঞ্জরে। সেদিন

ভরে উঠেছিলো তাঁর মাতৃহৃদয় কানায় কানায়। গুলবদনও কি প্রাপ্তির আনন্দে চোখ দুটিকে বন্ধ করে মায়ের উত্তপ্ত স্নেহ আস্বাদন করে নি? সে এক মনোরম মনোহর দৃশ্য। দীর্ঘদিন গুলবদন মায়ের কবোষ্ণ বুকটিকে আশ্রয় করে রইলেন।

ইতোমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। স্বয়ং সম্রাট হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ঘোড়াসুদ্ধ গঙ্গা পার হতে গিয়ে এক ভিস্তিওয়ালার বায়ুপূর্ণ মশকের কল্যাণে বেঁচে গেলেন। আর একটা দুর্বল সেতু ভেঙে পড়ে বহুজনের ঘটেছে প্রাণহানি। হারেমের বহু ললনার হয় মৃত্যু ঘটেছে, না হলে তারা নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। রাণী হাজী বেগম ধরা পড়েছেন আফগানদের কবলে। নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন আয়েশা সুলতান বেগম, চাঁদ বিবি এমন কি শিশু আকিকা বেগমও। ভাগ্য বিপর্যয়ের নানা দুঃখময় পর্যায় পার হয়ে হুমায়ুন ফিরে এসেছেন পুনশ্চ আগ্রায়। গুলবদনকে শেষ দেখেছিলেন বোধহয় তাঁর দশ বছর বয়সে। বালিকা গুলবদন তখন মাথায় পরতেন কুমারীর আবরণ 'তাক', এখন পরিবর্তে পরিধান করেছেন যৌবনবতী রাজকুমারীর মস্তকাবরণ 'লচক' (বিভারিজের অনূদিত হুমায়ুনামার ১৩৮ পৃষ্ঠায় এর বিবরণ আছে)। তিনকোণা ঐ মস্তকাবরণে ভারী সুন্দর দেখতে লেগেছিল স্নেহের বোন গুলবদনকে হুমায়ুনের। বোনকে ডেকে অনেক আদর করে দুজনে মিলে অনেক দুঃখ করেছিলেন মাতা মাহমের জন্যে। গুলের দু চোখে জল এসেছিল—একদিকে আনন্দাশ্রু, অন্যদিকে শোকাশ্রু।

এরই মধ্যে গুলবদনের বিয়ে হয়ে গেছিল চঘতাই-মোগল বংশের খিজর্ খাওয়াজা খানের সঙ্গে তার পনেরো বছর বয়সে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখ কই? ভ্রাতৃবিরোধে মোগল রাজবংশের সিংহাসন টলটলায়মান। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বৈমাত্রেয় ভাই কামরান যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে কামরানের তঞ্চকতাও লক্ষ্য করার মতো। গুলবদনকে তিনি তাঁর পক্ষভুক্ত করতে চান। তাই মিষ্টি কথায় বার বার হুমায়ুনকে লিখতে লাগলেন—'আমি নিদারুণ অসুস্থ, যদি গুলবদনকে পাঠাও, আমি খুবই বাধিত হবো।' হুমায়ুন, সরল হুমায়ুন গুলকে

ডেকে বললেন—বোনটি, কামরান অসুস্থ, তুমি এখনই তার কাছে যাও। হুমায়ুনের স্নেহে অভিসিঞ্চিত গুলের ঠোঁট দুটি ফুলে উঠল অভিমানে—তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ দাদা? তাড়িয়ে দিলেও আমি যাবো না।

হুমায়ুন পাগলী বোনের কাণ্ড দেখে অবাক। শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরেই হুমায়ুনের রাজ্যে শুরু হল অনিশ্চয়তার লঙ্কাকাণ্ড। শেরশাহের উপর্যুপরি আক্রমণে হুমায়ুন বিধ্বস্ত। তাঁর পাশে এ সময়ে এসে দাঁড়িয়েছেন গুলের সহোদর অগ্রজ হিন্দাল। কিন্তু গুল কোথায়? কামরান কি তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন? গুলবদন কি অভিমানবশতঃ দাদার বিপদের দিনেও কি মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন? ইতিহাসে সে কথার উল্লেখ কোথায়? গুলবদন তো আত্মকথা লিখতে বসেন নি, চেয়েছিলেন হুমায়ুনের রাজত্বের উত্থান-পতনের কাহিনী লিখতে। নিজে চোখে দেখেন নি এ সময়ের ঘটনাগুলি বলেই কি গুলবদন এখনকার কথা লেখেন নি? কাবুল থেকে দিল্লী-আগ্রার কথা জানা সহজ ছিল না সেকালে।

হুমায়ুনের সঙ্গে আবার তাঁর দেখা হল দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে। হুমায়ুন তখন পারস্যের শাহ তাহ্‌মাস্‌প্‌-এর আশ্রয় পেয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কান্দাহার পুনরুদ্ধারে তিনি এগিয়ে এসেছেন। দাদাকে কাছে পেয়ে গুলবদনের কি আনন্দ! সব অভিমান ঝেড়ে ফেলে একেবারে ছোট বোনটির মতো দাদাকে সাদরে নিলেন বরণ করে।

কামরানের আশ্রয়ের দিনও তাঁর শেষ হয়ে এল কামরানেরই ঔদ্ধত্যে। ক্ষমতালোভী কামরান একদিন বিমাতা দিলদারকে দারুণ অপমান করে বসলেন। গর্ভধারিণীর এই অপমানে গুলবদনের হৃদয়ের ভালবাসার স্নিগ্ধ প্রদীপ-শিখাটি বহ্নিশিখায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তীব্র প্রতিবাদ করে প্রবল ঘৃণায় কামরানের আশ্রয়কে করলেন প্রত্যাখ্যান। কামরান বুঝতে পারলেন ভুজঙ্গিনীকে দলন করা উচিত হয়নি। অমনি খোসামোদ করে সারা। বললেন, এখনই তাঁর প্রয়োজন গুলবদনের

স্বামী খিজ্‌র খাঁর সাহায্য। দাও তো ভাই খাঁ সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে।

পিত্তি জ্বলে উঠেছিল গুলবদনের। কিন্তু কামরানের নৃশংস চরিত্র তাঁর অজানা নয়। তাই মনে মনে ফেঁদে বসলেন একটা কৌশল। বললেন, দেখ ভাই—আমি তো স্বামীকে কোনদিন চিঠি লিখি নি। আমার হাতের লেখা তিনি চেনেনই না। জাল চিঠি ভেবে তিনি আসবেনই না হয়তো। মাঝখান থেকে তোমার অপমান হয়ে যাবে খামোকা। কাজ নেই ওঁর সাহায্য চেয়ে। আসলে কামরান চান সর্বদা হুমায়ুনের ক্ষতি। সেকথা বুদ্ধিমতী গুলবদনের অজানা নয়।

গুলবদনের মতো হিন্দালও চাইতেন না হুমায়ুনের সর্বনাশ। তাই জীবনের বিনিময়ে সেই ভালবাসার শিলমোহর এঁকে দিয়েছিলেন হিন্দাল। ২৩ নভেম্বর ১৫৫১ (আবুল ফজল লিখেছেন ২০ নভেম্বর) তারিখের রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত। সুরখাব আর গণ্ডমকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সিয়াহ অব নদীর তীরে মির্জা কামরানের আক্রমণে রাতের ঘন অন্ধকারে গোলমালের মধ্যে প্রাণ হারাতে হল বীর হিন্দালকে মর্মান্তিকভাবে। শহীদের মৃত্যু সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রিয়তমা ভগ্নী গুলবদনকে রেখে গেলেন এক নিদারুণ বেদনাভরা অবস্থার মধ্যে। গুলবদন লিখেছেন (ইংরাজি অনুবাদে)—'If that slayer of a brother, that stranger's friend, the monster, Mirza Kamran had not come that night, this calamity would not have descended from the heavens?'

আর অশ্রুদিয়ে বুঝি আরও লিখে গেলেন—

"আয় দরেঘা, আয় দরেঘা, আয় দরেঘা !
আফ্‌তাবম্‌ শুদ নিহান্‌ দর জের-ই-মেঘ !"

হায়রে হায়রে, হায়রে দুঃখ ! আমার সূর্য মেঘের আড়ালে গেল ঢেকে।

তারপর থেকেই গুলবদনের গোলাপের পাপড়িতে যেন শুষ্কতা দেখা দিল। গুল ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে নিয়ে যেতে লাগলেন। শেরশাহের প্রবল তাড়নায় বিহ্বল হুমায়ুন গুলবদন আর

সব মেয়েদের নিয়ে (১৫৫৬) পশ্চিম সিওয়ালিকের কাছে মানকোটের রাজশিবিরে উপস্থিত। গুলবদনকে সেই শিবিরে আমরা যেন দেখি এক বিবাগী সন্ন্যাসিনী। এক পরম ঔদাসীন্য, জীবনের প্রতি একটা নির্মোহ ভাব তাঁকে যেন কোন সুদূরের সত্তায় পরিণত করেছে। শুধু বই পড়ায়, কবিতা রচনায় এই সন্ন্যাসিনীর সময় কাটে। পতিপরায়ণা এই নারীর সংসারজীবনেও এসে গেছিল নিরাসক্তি। তাই সাদৎ-ইয়ার ছাড়া অন্য কোনো পুত্রকন্যার নাম পর্যন্ত তিনি উল্লেখ করেন নি।

জীবনের উপভোগের ক্ষণিকতা গুলবদনের বোধকে করেছিল গভীরভাবে আচ্ছন্ন। ঈশ্বরমুখিতাকেই তখন ভাবতে শুরু করেছিলেন জীবনের একমাত্র আচরিত বস্তু! পঞ্চাশ পার হয়ে গেছেন এখন গুল—এক পা পরপারের দিকে। এখনই তো প্রয়োজন আল্লাহ্-এর উপাসনা করা, প্রয়োজন মক্কাতীর্থ ঘুরে আসা। বিধবার (?) জীবনে এর চেয়ে প্রার্থিত আর কি হতে পারে? হুমায়ুন নেই। মহাসম্মানে পিতৃস্বসাকে রেখেছেন আকবর। ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে হজ-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন গুলবদন। সম্রাট নারাজ পিসিমাকে ছেড়ে দিতে। পরের বছর হজযাত্রার সময় এলে আকবরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ইচ্ছের কথা পুনরায় করে। রক্ষণশীল সম্রাট আর না করতে পারলেন না। পথের বিপদের ভয়ও গুলবদনকে পারল না তাঁর ইচ্ছা থেকে অপসারিত করতে।

গুজরাটের সাম্রাজ্যভুক্তি এবং গোয়ার বিদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় পরিস্থিতি অনুকূল বুঝে আকবর শেষে মক্কা যাত্রার ব্যবস্থা করলেন দুভাবে—একটি দল যাবে পুরুষদের, অন্যটি যাবে জেনানাদের নিয়ে। পুরুষদের জন্য তিনি তো দরবারে একটি পদই সৃষ্টি করে বসলেন—মীর হাজি—যিনি হবেন তীর্থযাত্রা দলের সরকার নিযুক্ত নেতা।

অক্টোবর ১৫৭৫। মেয়েদের দলটির সঙ্গে গুলবদন রওনা হলেন তাঁর প্রার্থিত ভূমির উদ্দেশ্যে। সঙ্গে গেলেন অন্তঃপুরের আরও নয়জন

গণনীয় মহিলা। তাঁদের মধ্যে প্রধান নুরু-দ্ দীন মুহম্মদের কন্যা, বৈরামখানের প্রাক্তন পত্নী এবং বর্তমানে আকবরের প্রধানা মহিষী সলীমা সুলতান বেগম। যাত্রাপথে যাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয় সেজন্যে বিস্তৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হল। শুধু গুলবদন যাচ্ছেন না। স্বামীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে স্বামীকে ছেড়েই যাচ্ছেন স্বয়ং বেগম সাহেবা। আরও আছেন গুলবদনের বৈমাত্রেয় ভাই অস্করীর বিধবা স্ত্রী সুলতানাম্ বেগম, মৃত কামরানের দুই মেয়ে হাজী ও গুল-ইজার বেগম এবং গুলবদনের পৌত্রী উম্-ই-কুলসূম্। যাচ্ছেন সালীমা খানম্—ইনি তো খিজর্ খাজার মেয়ে, গুলবদনেরই আত্মজা কি? আগ্রা থেকে সবাই রওনা হলেন। বেশ অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে এলেন আকবরের দুই বালক পুত্র সলীম ও মুরাদ। রওনা হলেন একটি তুর্কী জাহাজে—নাম 'সলীমী'। পুরুষদের নিয়ে রওনা হল আরও একটি জাহাজ 'ইলাহী'। সব খরচ দিলেন সম্রাট।

কিন্তু পোর্তুগীজরা অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। হলই বা রাজকীয় তীর্থযাত্রা। তাদের দাপট সমানে চলতে লাগল সমগ্র জল-পথে। এতএব আটকে পড়ে যেতে হল সুরাটে। সেও অল্প দিনের নয়—প্রায় একটা বছর। অবশেষে আশ্বাস পাওয়া গেল, পথিমধ্যে নারীদের ধর্ষিতা হবার আর ভয় রইল না। অতএব গ্যারান্টির কাগজপত্র নিয়ে জাহাজ পুনশ্চ পাড়ি দিল সুরাট বন্দর থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ল জাহাজ এডেনের কাছে। দীর্ঘকাল পড়ে থাকতে সেই নির্জন বন্দরে। শেষে অনেক ভুগে হজ সেরে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তীর্থযাত্রীরা এসে পৌঁছুলেন ফতেপুর সিক্রিতে। আজমীর ঘুরে দেখলেন চিশ্তী ফকিরদের পবিত্র বাসস্থান। কিন্তু কই আমরা তো গুলের কাছ থেকে এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ পেলাম না। এও সেই সন্ন্যাসিনীর আত্মগোপনের, আত্মবিস্মরণের অকথিত কাহিনী। আকবর তো তাঁকে হুমায়ুনের কথা লিখতে বলেছেন, কেন গুলবদন আত্মজীবনী লিখতে যাবেন?

কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমান রমণী গুলবদনের মধ্যে অন্য ধর্মের, বিশেষতঃ

খৃষ্টান ধর্মের প্রতি একটা জুগুপ্সার ভাব ছিল। হজ থেকে ফিরে এসে বুঝি সেটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। দমন-এর কাছে বুৎসর বলে একটা গ্রাম পোর্তুগীজদের দিয়ে হজ যাবার অনুমতি নিয়েছিলেন গুল বাধ্য হয়ে, খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর অনীহা হয়েছিল বুঝি ঐ পোর্তুগীজ দস্যুদের আচরিত ধর্ম ব'লেই। ফিরে আসার পর তাই তার মধ্যে বিরূপতা লক্ষ্য করা হল। সম্রাটের লোকজনদের বললেন, গ্রামটা কেড়ে নাও। তাই করতে গেলে পোর্তুগীজরা একটা মোগল জাহাজ আটকে রেখে দিলে। মোগলরাও একদল তরুণ ভ্রমণকারীদলের নয়জনকে গ্রেপ্তার করে বসল। এদিকে উপস্থিত পোর্তুগীজ যাজক ফাদার রাইভোলফো অ্যাকোয়াভিভা (AQUAVIVA)। দর্শনশাস্ত্রের এই অধ্যাপক কুমার মুরাদকে মাঝে মাঝে খৃষ্টধর্মের উপদেশ দিতেন। গুলবদন ফিরে এসে এই ব্যাপার দেখে দারুণ দুঃখিত হয়ে এর প্রতিবাদ করেন।

এখন গুলবদন প্রায় ষাট বছরের বয়সকে ছুঁই-ছুঁই। বাস করছেন আগ্রার রাজপ্রাসাদে। এখানে বসেই রচনা করেন অনেক কবিতা ফার্সী ভাষায়। শিক্ষিতা মহিলা গুলবদনের অন্তরে বাস করত একটি কবিপ্রাণ। আর রচনা করেন এক মনে 'হুমায়ুননামা'। আকবর আদেশ দিয়েছেন গুলবদনের জানা এবং স্মৃতিবাহিত যে সব ঘটনা বাবর এবং হুমায়ুনকে আশ্রয় করে আছে, সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আবুল ফজল সেই উপকরণ দিয়ে লিখবে আকবরের ইতিহাস। বাবরকে দেখেছেন সেই ছোট বয়সে। বাবরের অনেক কথাই তাঁর শোনা কথা মাত্র। তাই দেখি 'হুমায়ুননামা'য় বাবরের বর্ণনা কতো সংক্ষিপ্ত। হুমায়ুনের জীবন—তাঁর বিজয়যাত্রা, তাঁর পরাজয়, বিশ্বাসঘাতক কামরানের হাতে হুমায়ুনের ভাগ্যবিপর্যয়ের নানা কাহিনীতেই হুমায়ুন-নামার অধিকাংশ পৃষ্ঠা আকীর্ণ। অনেক রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়া তাঁর সময়ের নানা সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথাও এই উল্লেখযোগ্য বইটিতে জুগিয়েছে মূল্যবান উপকরণ। মোগলদরবারের আদব-কায়দা, তৈমুর বংশীয়দের রীতিনীতি, হিন্দালের বিয়ের বিচিত্র আখ্যানে হুমায়ুন-

নামা পরিপূর্ণ।

গুলবদনের আত্মসাক্ষী ও সততা, তথ্য সংগ্রহের প্রবল নিষ্ঠা বইটিকে করে তুলেছে বহুমূল্য। মাহম বেগম, খানজাদাহ বেগম, হামিদাবান্নু বেগমের কাছ থেকেও সংগৃহীত হয়েছিল ইতিহাসের নানা ঘটনা। মূলত ফার্সী ভাষায় লিখিত এই বইয়ে তুর্কী ভাষারও মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডিত্য তাঁর পাতায় পাতায় ছড়ানো, কিন্তু কী গভীর বিনয়ে নিজেকে ঘোষণা করেছেন একজন 'ইন হকীর' বলে—যার অর্থ নগণ্য নারী। তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে এই শব্দগুলি—আহওয়াল হুমায়ুন পাদশাহ্ জমহ্করদহ্ গুলবদন বেগম বিনৎ বাবুর পাদশাহ্ অম্ম আকবর পাদশাহ্।

গুলবদন নিশ্চয়ই শিক্ষিত নারী ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। সব মূল্যবান ঘটনাই প্রচুর আলোকপাতে উজ্জ্বল নয়। বানানের ভুলও কম নয় আবার অনেক বাক্যবন্ধ জড়ানো আর অস্পষ্ট। স্বামীকে চিঠিপত্রও লিখতেন। কিন্তু হাতের লেখা খুব একটা ভাল ছিল না। থাকার কথাও নয়। বিবাহের (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাল্য-বিবাহ) সঙ্গে সঙ্গেই তো অন্দরমহলের শিক্ষার ইতি ঘটতো। তবুও হুমায়ুননামার গুরুত্ব এতটুকু কম করে দেখার কিছুমাত্র কারণ নেই। এই গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন বলেই তো আকবর তাঁর উপর এই গুরুভার অর্পণ করেছিলেন।

লিখতে লিখতে গুলবদনের হয়তো আরও দশটা বছর কেটে গেছিল। স্বেচ্ছানির্বাসিতা এই মহিলার সেই দশ বছরের জীবনের কাহিনী আমরা জানি না। তারপর তাঁর জীবনে নীরবতার আরও দশ বারোটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। গুলবদন তখন আশি বছরের এক পূর্ণবয়স্কা সম্ভ্রান্ত মহিলা। আকবর তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় পালন করে চলেছেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গুলবদন একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। শয্যাপার্শ্বে আকবর জননী হামিদাবান্নু বেগম। হামিদা যখন তাঁদের সংসারে এসেছিলেন তখন গুলের বয়সই বা কতো—বছর আঠারো। দুই তরুণী বাঁধা পড়ে গেছিলেন ভালবাসার

গাঢ় সূত্রে। হামিদা তো তাঁর চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোটই ছিলেন। সেই হামিদাও এখন পরিণত বৃদ্ধা। হামিদা এসে ননদিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ওষুধ খাইয়ে দেন। আর ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করেন।

কিন্তু ভালবাসা দিয়ে যদি সবাইকে আটকে রাখা যেত! যায় না, যায় না। হামিদা বানুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই, ঐ আটকে রাখার বাণী উচ্চারণ করতে করতেই ৮২ বছরের গুলবদনের উজ্জ্বল চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেল (৭ ফেব্রুয়ারী ১৬০৩)। হামিদার কানে তখনও গুঞ্জরণ করে চলেছে গুলবদনের শেষ কথা কটি—'আমি চলে যাচ্ছি হামিদা, তুমি চিরজীবিনী হও।' 'অহন্যানি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং—'শেষে যাঁরা রইলেন, অগ্রগামিনীরা এ কথা জেনেও তাঁদের আয়ুষ্কামনা করেন। এইতো জীবন, এইতো মাধুর্য, এইতো প্রেম!

হুমায়ুনের অন্দরমহল

জহীরউদ্দীন মুহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী মাহমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নসীরউদ্দীন মুহম্মদ বলে যে ভাগ্যবান সন্তানটি তিনি তাঁর পরিচিত হুমায়ুন উপনামেই বিখ্যাত। ঘটনাক্রমে কিশোর বয়সেই তিনি তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করার দুর্লভ সুযোগ পান।

আর বিশ বছরের মধ্যেই তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়ে প্রথম সন্তানের জন্মও হয়ে গেছিল। প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে—গর্বিত পিতা হুমায়ুন চিঠি লিখে নবজাতকের ঠাকুর্দা সম্রাট বাবরকে সে সংবাদ জানিয়েছেন। ঠাকুর্দাও দারুণ খুশি হয়ে নবজাতকের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। হুমায়ুন আদর করে তাঁর প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন—'অল-অমান'—যার অর্থ সংরক্ষা। লোকে ভুল করে উচ্চারণ করত অলামন বা ইলামন—যার অর্থ যথাক্রমে 'ডাকাত' এবং 'আমি অনুভব করিনা।' নামকরণের এক দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম।

আসলে হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনের জন্মকুণ্ডলীতেই ছিল একটা দুর্ভাগ্যের রহস্যময়তা। তাঁর বিবাহিত জীবনের অন্তরালেও মাঝে মাঝে এই ভাগ্যহীনতার ছায়াপাত যে ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রেমের রহস্যময়তা, ভালবাসার হাতছানি এই দুর্ভাগ্যতাড়িত সম্রাটের অন্তরঙ্গ জীবনকে বেশ মনোরম করে লেছিল।

মোগলসম্রাটের অন্দরমহলে তাঁদের পত্নী-উপপত্নীর সংখ্যা নির্ণয় করতে যাওয়া একটা বোকামি। বাবরের পত্নী সংখ্যাকে সম্ভবত তাঁর পুত্র অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে হিসেবে গুণে এনেছি আমরা আটজনকে—যদিও দুজন ছাড়া অন্যেরা তাঁর জীবনে তেমন কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে উঠতে পারেন নি। তবে অন্দরমহল গুলজার করে রাখতে পেরেছিলেন অবশ্যই।

তাঁর প্রথম সন্তান অল-অমান—যাঁর কথা আগেই বলে এলাম—তাঁর গর্ভধারিণী ছিলেন বেগাবেগম। সম্ভবত ইনিই প্রথম বিবাহিত পত্নী ছিলেন হুমায়ুনের। এঁর একটা অন্য নামও ছিল—হাজী বেগম। ইনি ছিলেন হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাই কামরানের খুড়শ্বশুর (অর্থাৎ গুলরুখের নিজের কাকা) ইয়াদগার বেগের কন্যা।

প্রথম স্ত্রী বলেই কিনা জানি না, বেগা বেগম স্বামীর উপর একটু কর্তৃত্ব করতে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন, স্বামীকে তিনি কতটা ভালবাসেন বা বশে রেখেছেন লোকেদের কাছে, সতীনদের কাছে বিশেষ করে, তা দেখাতে। একটু তর্ক করতেন ভালবাসতেন, ভালবাসতেন একটু জেদ প্রকাশ করতেও। হুমায়ুন এমনিতে তাঁকে একটু প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর ছেনালীতে বুঝি একটুখানি মজাও পেতেন। কিন্তু সম্রাট বলে কথা। বেগমের আঁচল ধরা হয়ে থাকতে হুমায়ুনের আদৌ ইচ্ছে ছিল না। আর মোগল-সম্রাটদের অন্দর মহলে একটিমাত্র বেগমেরই তো অধিকার ছিল না। যদিও একজনই শেষ অবধি সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী হয়ে জীবনটাকে ব্যাপ্ত করে, অধিকার করে থাকতেন।

কিন্তু বেগা বেগম সেই প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। হতে পারতেন, কিন্তু বোধকরি মুখরা বলেই হয়ে উঠতে পারেন নি। তবে শাশুড়ীর ভালবাসা সম্ভবত পেয়েছিলেন। আর সে ভালবাসা পাবার ইতিহাসটি বেশ মুখরোচক। ছেলের বিয়ে হয়েছে, নাতির মুখ দেখবার জন্য বাবর-পত্নী মাহম একেবারে পাগল হয়ে উঠতেন। সেজন্য চোখে কোনো সুন্দরী, শ্রীযুক্ত মেয়ে দেখলেই তার গর্ভে হুমায়ুনের সন্তান প্রার্থনা করে বসতেন। পাঠিয়ে দিতেন হুমায়ুনের কাছে। হুমায়ুনের সেবা করতে গিয়ে তাঁরা অন্দরমহলে স্থান পেয়ে যেতেন। এমনি এক মেয়ে মাহমের নজর কেড়ে নিলেন। তাঁর নাম মেওয়া-জান। দারুণ দেখতে—টানা টানা চোখ আর টিকলো নাক। মনে ধরে গেল মহিষী মাহমের। আসলে সে ছিল এক সামান্য রাজকীয় কর্মচারী খদঙ্গ-এর মেয়ে। ওসব কিছুই গণ্য করলেন না সম্রাট জননী। তখন বাবরের (ফিরদৌস মকানী) মৃত্যু হয়ে গেছে। একদিন মাহম সোজা গিয়ে পুত্রকে ডেকে বলেই বসলেন—'দেখ হুমায়ুন, মেওয়া-জানকে তোমার কেমন লাগে ? ও মেয়েটাতো দেখতে শুনতে মন্দ নয়। তবে কেন তুমি ওকে তোমার হারেমের অন্তর্ভুক্ত করছ না।'

হুমায়ুন আর কি করেন। মায়ের আদেশ। তদুপরি সুন্দরী ললনা। সেই রাতেই হুমায়ুন মেওয়া-জানকে শয্যাসঙ্গিনী করে নিলেন। অন্দর

মহলে ভর্তি হয়ে গেলেন নেওয়াজান। বেগা বেগম তখন কাবুলে আর আগ্রায় এলেন তাঁর সপত্নী। জানতেও পারলেন না তিনি।

এর মধ্যে একদিন তিনি এসেও গেলেন কাবুল থেকে আগ্রায়। ঠিক মেওয়াজানকে বিয়ে করার তিন দিনের মাথায়। অন্দরমহলের দুটি বধূ এসে শাশুড়িকে শুভ সংবাদ জানালেন। দুজনেই সন্তান-সম্ভবা, গর্ভবতী। দারুণ খুশি হয়ে উঠলেন মহিষী মাহম। ঘোরেন-ফেরেন আর বলেন—দু দুটো বউ গর্ভবতী, কারও না কারও ছেলে হবেই। বেগা বেগমের প্রথম সন্তান বেশিদিন বাঁচেনি। তাই মহিষীর আশা এবারেও হয়তো আবার ছেলে হবে। মেওয়া-জানকেও ভালবাসতেন খুব। তিনিই তো তাঁকে পছন্দ করেছিলেন। ভাবছেন তাঁর গর্ভেও পুত্র সন্তান হবে। নাতির মুখ দেখবেন বলে দু প্রস্থ অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিয়ে বসলেন। যার ছেলে হবে তাকেই আমি ভাল ভাল অস্ত্র উপহার দেবো। এই বলে খুব যত্ন-আত্তি করে দুপ্রস্থ অস্ত্র ভালকরে বেঁধে গুছিয়ে রেখে দিলেন।

আর গড়ালেন সোনা আর রূপো দিয়ে আখরোট বাদাম। মোগল সেনাপতিদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রও খুঁজে পেতে সংগ্রহ করে রাখলেন তিনি। তাঁর পর দিন গুনতে লাগলেন। তর সইছে না যেন তাঁর। কিন্তু হা হতোস্মি। বেগা বেগম এ কি প্রসব করলেন। কন্যাসন্তান? দারুণ মুসড়ে পড়লেন মাহম। যতই আদর করে মেয়ের নাম রাখা হোক অকীকা—মাহমের একটুও ভাল লাগল না।

এবার একমাত্র ভরসা ঐ মেওয়া-জান। কিন্তু সবুরেও তো মেওয়া ফলল না। দশ মাস পার হয়ে এগারো মাস এল। মেওয়াজান শাশুড়িকে বলেন—ভাবছেন কেন আম্মা। আমার স্বর্গত শ্বশুরের জ্যেঠা মশায় উলূঘ বেগের হারেমে ছিলেন আমার এক মাসী। সে মাসির ছেলে হয়েছিল পাক্কা বারো মাস পার হয়ে। আমি হলাম সেই মাসির বোন্‌ঝি।

কথায় বলে লোকে আশায় ঘর বাঁধে। মাহমও তৈরি করালেন আঁতুড় ঘরের জন্যে তাঁবু। ছোট্ট বাচ্চার কথা ভেবে তৈরি করানো হল মখমলের বালিশ তিসি ভর্তি করে। কিন্তু এবারেও সেই হা হতোস্মি।

বারো মাস পার হয়ে গেল। মেওয়া ফলল না। শেষ অবধি জানা গেল —সব মিথ্যে। বেগা বেগমের তো একটা মেয়ে অন্তত হয়েছে। মেওয়াজানটা বড্ড মিথ্যেবাদী। বড্ড ঠক আর প্রবঞ্চক। শাশুড়ির আদর পাবে বলে এতোদিনে মিথ্যের জাল বুনে এসেছে। তার গর্ভ-সঞ্চারই হয় নি। অনুমান করতে পারি বাঁদীটাকে অনাদরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন হুমায়ুন। এ যেন বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশি, রাই হেন কতো মিলবে দাসী। কোনোক্রমে অন্দরমহলে মেওয়া-জানের দিন কাটতে লাগল।

কাজেই কন্যা সন্তান হলেও বেগা বেগমের আদর বেড়েই গেল। এমনিতেই গরবিনী ছিলেন। আবার সম্রাটের কন্যার জননীও। অহঙ্কার বাড়ল বৈকি। শাশুড়ির নেক নজরে আছেন। হুমায়ুন তখন সবাইকে নিয়ে গোয়ালিয়রে বেড়াতে যাচ্ছেন। বেগা বেগম তাঁর মেয়েকে নিয়ে আগ্রাতেই আছেন। শাশুড়ির মন খুব খারাপ। আদরের বৌটিকে না হলে তাঁর বেড়ানোই সার্থক হবে না। ছেলের কাছে গিয়ে বললেন—দেখ বাবু, এ আমার ভাল লাগছে না। বাড়ির বড় বৌ, বড় মেয়ে সঙ্গে যাবে না—তা কি হয়! ওরাও একটু ঘুরবে, দেখবে—তবেই না আমার ভাল লাগবে। তুমি বাবু, ওদের আনিয়ে নাও। নইলে খুব বিশ্রী লাগছে।

ওদের নিয়ে আসার জন্যে মাহম নিজেই পাঠিয়েছিলেন নৌকর আর খওয়াজা কবীরকে। এসে গেলেন ওঁরা। পুরো দুটো মাস আনন্দে কাটালেন সবাই মিলে গোয়ালিয়রে।

এমন বেগমের যদি গর্ব না হয়, তো কী হবে। এর মধ্যে মাহম মারা গিয়ে তাঁর একটু অসুবিধে হল। তবুও গরবে তিনি টলমল করতে লাগলেন। তখন হিন্দালের বিয়ে হয়ে গেছে। সেই উপলক্ষে বিশাল আড়ম্বর-জাঁকজমক হয়ে গেল। নতুন ছাউনি বসেছে জর আফশান বাগে। দিলদার বেগম, মাসুম সুলতান বেগম, গুলরঙ বেগম, গুলবার্গ বেগম, বেগা বেগম সবার আলাদা আলাদা ছাউনি। হুমায়ুন নিজে যেতেন সেই সব ছাউনি তৈরি করা পরিদর্শন করতে। তারই ফাঁকে দেখা করতেন বেগম আর বোনেদের সঙ্গে।

একদিন এলেন গুলবদনের ছাউনিতে। অনেক রাত অবধি সবার সঙ্গে গল্পগুজব খানাপিনা করে সম্রাট হুমায়ুন বোনদের আর বেগমদের কাছেই একত্রে মাথায় তাকিয়া দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুব ভোরেই রোজ ঘুম ভাঙে বেগা বেগমের। প্রতিদিনই তিনি সম্রাটকে জাগিয়ে দিয়ে ভোরের নমাজ পড়তে পাঠিয়ে দিতেন। সেদিনও তিনি সবাইকে ডেকে জাগিয়ে দিলেন। হুমায়ুনের ঘুম ভেঙে গেছিল আগেই। বেগা বেগমকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ওজু করার জল আমাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

সুযোগ পেয়ে গেলেন বেগা বেগম। সেই সাতসকালেই গরবিনী বেগম ভালবাসার নাকে-কান্না জুড়ে দিলেন। বলতে লাগলেন—"ক'দিন ধরেই তো এই বাগে আসছ তুমি। কিন্তু একবারও আমাদের ওখানে তোমার ছায়া পড়ল না। কেন? আমাদের ওখানে যাবার পথে তো আর কাঁটা পোতা নেই। একদিন আমাদের ছাউনিতেও তুমি যাবে, সেখানেও এমন গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদ, খানাপিনা, মজলিস হবে, এ আশা তো আমরাও করতে পারি, সে সাধ আমাদের মনেও জাগে। এ হত-ভাগিনীদের দিকে কত দিন আর এমন মুখ ফিরিয়ে থাকবে? আমাদের তো মন বলে একটা পদার্থ আছে। অন্যদের ওখানে এর মধ্যে অন্তত তিনবার করে গেছ তুমি, এক জায়গায় গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদ করে পুরো দিন আর রাত্তির কাটালে, অথচ আমাদের বেলায়—'

কান মাথা লাল হয়ে উঠল সম্রাটের। এমন সুন্দর সকাল বেলাটা একেবারে তেতো হয়ে উঠল। তর্কবিতর্কে কোন অভিরুচি হল না তাঁর, নমাজ পড়বার সময় হয়ে গেছে। কোন উত্তর না দিয়ে সম্রাট ধীরে ধীরে নমাজ পড়তে এগিয়ে গেলেন।

নমাজ পড়া শেষ করেছেন হুমায়ুন। এক প্রহর বেলা হয়েছে। একে একে ডেকে পাঠালেন সব ছাউনি থেকে বিমাতা দিলদার বেগম, আফগানী অগাচহা, গুলনার অগাচহা, মেওয়া-জান বেগম, আঘা-জান, এমন কি ধাইমা দুধ-মাদের।

পরস্পরের মুখ চাইতে চাইতে সবাই এসে হাজির। বেগা বেগমও

এসেছেন। সম্রাট হুমায়ুনের মুখ থমথমে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভেতরটা তাঁর গজরাচ্ছে। সকলের দিকে একবার করে তাকিয়ে দেখলেন বেগা বেগম কোথায় বসেছেন। তারপরে কোনো ভণিতা না করে বেগা বেগমের চোখে স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি রেখে বললেন—'বিবি! তোমার প্রতি বিরূপ ব্যবহারের এ কেমন ধারা অভিযোগ আজ সকালে আনলে তুমি? আর যেখানে বসে অভিযোগ করলে সেটা কি তার মানানসই জায়গা? তোমরা সকলেই জানো, যারা সম্পর্কে (আমার এবং) তোমাদের সকলেরই গুরুজন, তাদের সঙ্গেই এ যাবৎ দেখা করার জন্য গেছি। তাদের সুখী করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে বলেই তা করা আমার দিক থেকে একান্ত কর্তব্য। বরং আমি লজ্জিত যে তাদের কাছে আরো ঘন ঘন যাওয়া আমার পক্ষে হয়ে ওঠে না। অনেকদিন থেকেই এজন্য আমি ভাবছি এ ব্যাপারে প্রত্যেককে একটি সই করা ঘোষণা লিখে দেওয়ার অনুরোধ জানাবো। আজ শেষ পর্যন্ত সেই পদক্ষেপ নেওয়ার পরিস্থিতিতেই আমাকে টেনে নিয়ে এলে। সকলেই জানো, আমি একটা আফিংখোর মানুষ। যদি কারো কাছে যেতে-আসতে আমার বিলম্ব হয় সে-জন্য কেউ তোমরা রাগ করো না যেন। বরং আমার কাছে এরকম একটি পত্র লিখ: আসো কি না আসো সে তোমার খুশি। তুমি যা করবে তাতেই আমরা তৃপ্ত ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

সমস্ত ঘরটা হুমায়ুনের গম্ভীর গলার আওয়াজে গভীর হয়ে উঠে নিস্তব্ধ হল। বেগা বেগম ছাড়া সবাই হাতজোড়। অন্য বেগমরা সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুনের প্রস্তাবে সায় দিয়ে উঠলেন। গুলবার্গ বেগম তো তাড়াতাড়ি কলমদানি আনিয়ে সম্রাটের বয়ান মতো একটি চিঠি লিখে হুমায়ুনের পায়ের কাছে নামিয়ে কুর্নিশ করে বসলেন।

কিন্তু সারাক্ষণ তুর্কী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বসে রইলেন বেগা বেগম। তারপর তাঁর মধ্যে সেই তার্কিক মানুষটা আবার জেগে উঠল। বললেন—'ত্রুটির চেয়ে তার কারণ হিসাবে এ রকম একটা কৈফিয়ৎ আরো বেশি নিন্দার। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে জাঁহাপনা যাতে

আমাদের মাথা উঁচু করে তোলেন সেজন্যই আমরা এ রকম অনুযোগ করেছি। জাঁহাপনা নিজেই ব্যাপারটিকে টেনেটুনে এখানে এনে দাঁড় করালেন। এরপর আমাদের আর কি করার থাকতে পারে। আপনিই সর্বেসর্বা সম্রাট।'

এই বলে নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন তিনিও সম্রাটকে তাঁর বয়ান মতো একটা চিঠি লিখে দিলেন। আগুনে জল পড়ল। হুমায়ুন শান্ত হলেন। তখনকার মতো ব্যাপারটির সেখানেই ইতি ঘটল।

এর পরেও কিন্তু বেগা বেগমের হাঁকডাক কমে গেছিল, তা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু একটা অবাঞ্ছিত অসম্মান যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিল। শেরশাহের তাড়নায় হুমায়ুন বেগম আর আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এক যুদ্ধক্ষেত্রের পর অন্যত্র। একবার তো নিজে পালাতে গিয়ে ঘোড়াসুদ্ধ যমুনা নদীতে ডুবে মরেই যাচ্ছিলেন। এক মশক-ভিস্তিওয়ালার জন্যে প্রাণে গেলেন বেঁচে। আর সে সময়েই একটা সরু সেতু পার হতে গিয়ে ভার সইতে না পেরে সেটা ভেঙে যেতেই পরিবারের লোকজনেরা পড়ে গেলেন ভরা যমুনা নদীতে। কেউ কেউ মারা গেলেন ডুবে। কেউ বা বন্দী হলেন শত্রুর হাতে।

ডুবে গিয়ে অদৃশ্য হলেন চিরতরে সুলতান হুসেন মির্জার কন্যা আয়েসা সুলতান বেগম, বাচকা নামে বাবরের এক খলিফা (পরিচারিকা), বেগাজান্ কূকা, কন্যা অকীকা বেগম, চাঁদ বিবি আর শাদ বিবি। আট বছরের মেয়েকে হারিয়ে বেগা বেগম কাঁদতে পর্যন্ত পেলেন না।

কারণ ? কারণ তিনি নিজেই হলেন শত্রুহস্তে বন্দিনী। অবিশ্যি শত্রুরা বহু মান্য করে তাঁকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু খুব কি আর হুমায়ুনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে পারলেন তিনি ? কিন্তু আত্ম-গরবিনী মেয়েরা সহজে নিজেদের ভুলে যায় না। অন্দরমহলে নতুন বেগম এসেছেন হমীদা বানু। বেগা বেগমেরও দিন গেছে কি ? বোধহয় যায় নি তখনও। নিজের সাজপোজ নিয়েই মশগুল থাকতেন তিনি। তাতেই সুখ।

যেদিন রীওয়াজ ফুল কেমন করে ফোটে দেখার জন্য বায়না ধরে বেগমরা কোহ গেলেন, সেদিন তো বেগা বেগমের সাজ করা আর ফুরোয়ই না। কমলা বাগিচায় সম্রাটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও তার সমান সাজগোজ। এমনি করে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে থাকতে এই রূপ-গরবিনীর বয়স বাড়ল। হজ করে ফিরে এসেছেন গুলবদন আর হমীদা বানুরা। বয়স বেড়ে বেগা বেগম তখন সত্তর পার হয়ে গেছেন। হুমায়ুন যখন চলে গেছেন তখন তাঁর বয়স কতই বা, বড়জোর পঁয়তাল্লিশ। তারপর থেকে শুধু হারেমে থাকার সুখ, স্বামী-সোহাগিনীর সুখ নেই। এমনি করেই স্বামীর মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর বাদে বেগা বেগমও চলে গেছিলেন। বেঁচে থেকে তাঁর সুখই কি বা। একটা ছেলে একটা মেয়ে সবাই তো তাঁকে সেই কোন সকালে ছেড়ে চলে গেছে! দিল্লীতে তাই একমনে স্বামীর সমাধি রচনা করে গেছেন মৃত্যুর আগে (১৫৬৯)। তবে বাঁচার একটা আশ্রয়ও তিনি পেয়েছিলেন হুমায়ুনের অপর স্ত্রী হমীদা বানু বেগমের পুত্র আকবরকে ভালবেসে। এতো ভালবাসতেন এই পুত্রটিকে পুত্রহারা জননী, যে ঐতিহাসিকেরা তাঁকে আকবরের নিজের মা বলেও গুলিয়ে ফেলেছেন।

বেগা বেগমের দারুণ প্রতিপত্তির মধ্যে হারিয়ে গেছে গুলমার্গ, চাঁদবিবি, বখ্শী বানু, খানীশ আঘা গুলওয়ার বিবিদের দল। কেউ শুধু জন্ম দিয়েছে একটি পুত্র অথবা একটি কন্যাকে। ব্যস, তারপরে লেগেছেন ক্বচিৎ সম্রাটের শয্যাসঙ্গিনীর সামান্য উপকরণ হিসেবে। অন্দর মহলের বাইরে তাঁদের জীবন আর এতটুকুও বিকশিত হতে পারেনি।

তবুও মাহচূচক হতে পেরেছিলেন হুমায়ুনের দিলের একাংশের অধিকারিণী। বদকশানে থাকার সময় মাহচূচক হুমায়ুনকে একটি কন্যা সন্তানও উপহার দেন। হুমায়ুন সে সময় একটি স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্ন অনুসারে এই কন্যার নামকরণ করেন বখ্ত-নিশা। এই নামকরণের স্বপ্নাদ্য ব্যাপারটি সম্রাট হুমায়ুনের ভাষায় এমনি করেই ঘটেছিল—'আমার যামা (ধাত্রীমাতা) ফখর-উন্নিসা ও দৌলত বখ্ত দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলেন, এটা ওটা কি যেন নিয়ে এলেন, তারপর আমাকে

একা ফেলে রেখে চলে গেলেন।' এই স্বপ্ন থেকেই তিনি ঠিক করলেন এ দুজনের নাম মিলিয়েই তিনি কন্যার নামকরণ করবেন। একজনের থেকে নিলেন বখ্‌ত, অন্যজনের থেকে নিশা। তাই নিয়ে নবজাতিকার নাম রাখলেন বখ্‌ত-নিশা।

স্বভাবতই গৌরবান্বিতা হয়েছিলেন মাহচূচক বেগম। তাঁর গর্ভে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেছিল তাঁর এক পুত্রসন্তানও। আগ্রায় সে খবর নিয়ে এসেছিলেন এক দূত শাহওয়ালী। দারুণ খুশি হয়েছিলেন সম্রাট। দূতকে খুশি হয়ে সুলতান উপাধি দিয়ে বসেছিলেন আর নবজাতকের নাম রেখেছিলেন ফারুক-ফাল। মাহচূচক হয়েছিলেন শাকিনা বানু, অমীনা বানু আর মহম্মদ হকীমেরও গর্ভধারিণী। তাই নিয়েই তিনি খুশী ছিলেন। পাটরাণী হবার স্বপ্ন দেখেন নি।

সে স্বপ্ন দেখেনে নি হমীদা বানু বেগমও। কিন্তু তাঁর নসীবে তা-ই লেখা ছিল। নইলে যে সম্রাটকে একদা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যৌবনের মদমত্ততায়, তাঁরই প্রিয়তমা মহিষী হয়ে উঠতে পারলেন ঘটনা-চক্রে? সে এক রোমাঞ্চকর প্রেমের পরম উপাখ্যান। মোগল অন্দর মহলের সে এক মনোমুগ্ধকর কাহিনী।

হুমায়ূনের তখন ভাগ্যবিপর্যয় চলছে। শোনা গেল ভাই হিন্দালও তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে মীর্জা কামরানের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কান্দাহারে একটা শিবির করে নাকি বসবাস করছেন। হুমায়ুনের নামে নানা অপবাদ শুনে তিনি তিতিবিরক্ত। হুমায়ুন ব্যাপারটিকে সরেজমিনে জানবার জন্যে ঠিক করলেন হিন্দালের কাছে যাবেন। ভক্করের কাছে সিন্ধুনদ পার হয়ে চলে গেলেন হিন্দাল। হুমায়ুন ভক্কর অধিকার করে আছেন। হুমায়ুন খোঁজ নিয়ে জানলেন সিন্ধুনদ থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে পতর বলে একটি গ্রামে হিন্দাল ছাউনি ফেলে আছেন, কান্দাহারে যান নি। যাবেনও না। এটা একটা মিথ্যা প্রচার মাত্র।

খুশি হয়ে হুমায়ুন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে গেলেন। হিন্দাল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্রাট ভাইকে সম্বর্ধনা জানালেন। তাতে মীর্জা হিন্দালের অনুগামী ছাড়া তাঁর হারেমের মহিলারাও সম্রাটকে অভিবাদন

জানালেন।

হারেমের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন একটি চতুর্দশী কিশোরীও। অপরূপ রূপলাবণ্যবতী এই তন্বীকে সম্রাট আগে কোনদিন দেখেন নি। দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং প্রথম দর্শনেই প্রেমাহত হয়ে সম্রাট প্রেমনিবেদনের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়লেন।

কোন ভূমিকা না করেই সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে ? উত্তর এল—মীর বাবা দোস্ত-এর মেয়ে। মেয়েটির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খওয়াজা মুয়জ্জন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, সম্রাটও আমাদের বংশের লোক আর মেয়েটিও আমার আত্মীয়।

আসলে এই ইরাণী রূপসী কিশোরী প্রায়ই হিন্দালের অন্দর মহলে আসতেন। হুমায়ুনও মাঝে মাঝে দিলদার বেগমের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন অন্দর মহলে। একদিন স্পষ্টতই বিমাতার কাছে প্রস্তাবই করে বসলেন—মীর বাবা দোস্ত যেহেতু আমাদের আপনার লোক, তখন আপনি যদি তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহলে ব্যাপারটা শোভনই হবে। (একটা কথা এখানে স্পষ্ট করা দরকার—গুলবদন বলেছেন কিশোরীটি মীর বাবা দোস্ত-এর কন্যা। জৌহর বলেছেন তিনি হিন্দালের 'অখুন্দে'র মেয়ে। মীর মাসুম বলেছেন তিনি হলেন শেখ আলী আকবর জামীর কন্যা। মনে হয় মীর বাবা দোস্ত এই আলী সাহেবেরই অন্য নাম।)

প্রস্তাব শুনে হিন্দাল রেগে আগুন। এমন একটা অশোভন প্রস্তাব কি করে হুমায়ুন দিলেন। মীর বাবা তাঁর উপদেষ্টা, তাঁর শিক্ষক। তাঁর মেয়েকে হিন্দাল নিজের বোনের মতো, এমনকি নিজের মেয়ের মতো মনে করে আর বড় ভাইয়ের মতো হুমায়ুন কিনা তাকে বিয়ে করতে চায় ? আল্লা করুন, ব্যাপাটার এখানেই শেষ হোক, বিয়েটা যেন না ঘটে !

দুজনের মধ্যে একটা দারুণ কলহ প্রায় ভেঙে পড়ে দেখে হুমায়ুন রেগে পতর থেকে একেবারে চলে এলেন ভক্করে। তারপর দিলদার বেগম একটা চিঠি লিখলেন হুমায়ুনকে—পুত্র, তুমি বাপু একটুতেই

রেগে যাও। হিন্দালটা আমার পাগল ছেলে, তুমিও পাগল ব্যাটা। তোমরা তো জান না, তুমি বলবার আগেই মেয়েটির মা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। আশ্চর্য, তুমি রেগে চলে গেলে কি হবে বলো তো!

হুমায়ুন দারুণ খুশি। তিনিও লিখে পাঠালেন—যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হয় মা, দারুন খুশি আমি। আপনি যা হয় একটা করুন। আপনি যা বলবেন আমি সুবোধ বালকের মতো মাথা নিচু করে মেনে নেবো। আর পণাপুণি নিয়ে যে কথা তারা তুলেছে, সে নিয়ে কোনই অসুবিধে হবে না। সে তাঁরা যা বলবেন, তাই মেনে নেবো আমি। এখন শুভকার্যের জন্য আমি পথ চেয়ে রইলাম।

চিঠি পেয়ে দিলদার বেগম নিজেই ভকরে গিয়ে পুত্র হুমায়ুনকে নিয়ে এলেন। একটা বড় মিলন সমাবেশ হল। হুমায়ুন সরেজমিনে সব শুনে খুশি। কিন্তু কাজ এগোচ্ছে কই?

আবার একদিন এলেন তিনি বিমাতার কাছে। এসেই বললেন—আর কতো অপেক্ষা করা যায়। আপনি একবার হমীদা বানুকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন।

সম্রাট ডেকে পাঠিয়েছেন। কিশোরী হামীদা আসবেন এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু যা প্রত্যাশা করা যায়, জীবনে তা কি সর্বদা ঘটে! হমীদা এলেন না। তুর্কী বেবাগা ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে উল্টে জবাব দিল—কেন, কি জন্যে যাবো? শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে? সে তো তাঁকে আগেই জানিয়ে নিজেকে ধন্য করেছি। বার বার কেন? আবার যাবো কেন?

—আসবে না? এতো গরব! ডেকে পাঠালেন হুমায়ুন সুভান কুলীকে। বললেন—যাও মীর্জা হিন্দালকে গিয়ে বল, সে যেন এখনই বেগম হমীদা বানুকে পাঠিয়ে দেয়।

হিন্দাল বলে পাঠালেন—অসম্ভব। আমি হাজার বার বললেও সে কিছুতেই যাবে না। বরং সুভান সাহেব তুমি নিজে গিয়ে হমীদাকে বল।

সুভান আর কি করেন, সম্রাট রেগে যাবেন। অতএব হমীদার কাছে গিয়ে অশেষ সৌজন্য দেখিয়ে হুমায়ুনের ইচ্ছাটুকু সবিনয়ে নিবেদন করলেন। হমীদা আবার জ্বলে উঠলেন। কিন্তু দারুণ বাক্‌চাতুর্যের সঙ্গে বললেন—আপনি সম্রাটকে গিয়ে বলুন—রাজদর্শন একবারই নিয়মমাত্র, দ্বিতীয়বার নিষেধ। অতএব আমার তো যাওয়া চলে না।

সুভান নতমস্তকে এসে সে কথা নিবেদন করতেই হুমায়ুনও জ্বলে উঠলেন। বললেন দাঁতে দাঁত চেপে—ও, তাই নাকি? আচ্ছা দেখা যাক—আমিও পুরুষ মানুষ! সে নাকি রাজবধূ হতে নারাজ! আমি তাকে সম্রাটবধূ বানিয়ে তবে ছাড়ব। ঠিক আছে।

আপত্তি করার কারণ ছিল বইকি হমীদার। সে তো সবে মাত্র চোদ্দ পূর্ণ করেছে। সম্রাট তাঁর বয়সের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। হুমায়ুনের বয়স তখন সাড়ে তেত্রিশ। তাঁর জন্ম ৬ই মার্চ ১৫০৮।

তাছাড়া হমীদাই তো হুমায়ুনের একমাত্র পত্নী হবেন না! তাঁর হারেম তো এমনিতেই বিবাহিত-অবিবাহিত পত্নীতে পরিপূর্ণ। দু'দিন থাকবে নেশা, তারপর যখন নেশা টুটে যাবে হমীদা কোথায় পড়ে থাকবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, হুমায়ুন সম্রাট বটে তবে এমন ভাগ্যবিড়ম্বিত সম্রাট যে তাঁকে কেবল পালিয়ে বেড়াতে হয়। এমন লোকের সঙ্গে কি কেউ সাধ করে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নেয়!

কিন্তু মানুষ যা ইচ্ছে করে, তা-ই কি হয়! পাকা চল্লিশটা দিন ধরে প্রেমের টানাপোড়েনের খেলা চলতে লাগল। টানার ঘর শূন্য, পোড়েনের মাকু কেবল এঘর ওঘর করতে লাগল। দিলদার শেষ অবধি একদিন হমীদাকে ডেকে বোঝাতে বসলেন—দেখ মা, তোমার বয়স হয়েছে, বিয়ে তো তুমি একদিন করবেই। আর তা যদি করতে হয়, তবে বল তো মা, রাজার চেয়ে সেরা বর আর কে হতে পারে?

হমীদার কি জেদ!—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। বিয়ে আমাকে একদিন করতে হবে, সে ঠিক কথাই। কিন্তু আমি এমন পুরুষকে বিয়ে করতে চাই যার কাঁধ ইচ্ছে করলে আমি হাত দিয়ে ছুঁতে পারি। হাত বাড়িয়ে যার জামার কোনাটুকুও ছুঁতে পারবো না—তাকে কখনই নয়।

অর্থাৎ হমীদা বোঝাতে চাইলেন—যাঁকে তিনি নিজের নাগালের মধ্যে ভাববেন তাঁকেই তিনি স্বামী হিসেবে পেতে চান—অন্যকে নয়।

তবুও দিলদার থেমে থাকতে পারেন না। বিবাহার্থী পুরুষ শুধু তাঁর পুত্রসম নন, স্বয়ং সম্রাটও। একটা যুদ্ধও হয়তো ঘটে যেতে পারে। একবার তাঁর মনে হল, এ তাঁর ছেলের এক আশ্চর্য পাগলামি। শত্রুর তাড়নায় ছুটে ছুটে পালাতে হচ্ছে। বৈমাত্রেয় ভাই কামরান তো বিদ্রোহীই, হিন্দাল পর্যন্ত রেগেছে। শেরশাহ সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবুও কি আশ্চর্য এই প্রেমের নেশা!

শেষে ধৈর্যের ফল ফলল। হমীদা মত দিলেন। শক্ত ও শক্তিমান পুরুষকে মেয়েরা বুঝি ভাল না বেসে পারে না। শেষে ঐ পতরেই বিয়ের বাসর বসল—হিজরী ৯৪৮ অব্দের জুমাদ-উল-অওয়াল মাসের এক সোমবারের দুপুরে (১৫ আগস্ট ১৫৪১ খৃস্টাব্দ) হুমায়ুন-হমীদার বিয়ে হয়ে গেল এক শুভলগ্নে। হুমায়ুন নিজেই পঞ্জিকা দেখে শুভদিন স্থির করলেন। কন্যার পিতার হাতে তুলে দিলেন নগদ দু'লাখ টাকা। মীর আবুল বকা-কে ডেকে পাঠানো হল। তিনি এসে দুজনকে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দিলেন।

বিয়ের পর তিনটি দিন যুগলে কাটালেন ঐ পতেরই। তারপর দুজনে রওনা হলেন ভক্করের নৌকোয় চড়ে। হমীদা বানু বেগমের জীবনে সেই দুর্গতি আর সম্মানের সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল।

মাসখানেক ভক্করে থাকলেন দুজনে। হিন্দাল তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। নববিবাহিত বেগমকে নিয়ে হুমায়ুন রওনা হলেন সিহওয়ানের পথে। কিন্তু সে পথ নিদারুণ কণ্টকিত—শত্রুসৈন্যে বিমর্দিত হলেন কতবার সম্রাট। শাহ হুসেন করলেন বিশ্বাসঘাতকতা, মালদেবের সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ। কোথাও এগোন, কোথাও পিছিয়ে যান।

এবার চলেছেন উমরকোটের দিকে। ঠিক যাবার আগেই দুজন গুপ্তচরের আক্রমণে সম্রাটের ঘোড়াটির মৃত্যু হল। হমীদা বানু গর্ভবতী। তার জন্যে প্রয়োজন একটি ঘোড়ার। তারদী বেগের কাছে চাইলেন একটি ঘোড়া। তিনি নারাজ। শেষে বদনা-বাহক জৌহরের

উটটিতে চড়ার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় শুনতে পেয়ে আকবরের ভবিষ্যৎ ধাত্রী মাহম অলগের স্বামী নদীম বেগ নিজের ঘোড়াটি এনে দিলেন সম্রাটকে।

রাজস্থানের পথে চলেছে সম্রাটের অনুগামী দল। তাঁর অন্দরমহলও এখন পথে বেরিয়ে পড়েছে। হায় হতভাগ্য সম্রাট! কি দুর্গম সেই মরুময় পথ! অর্থের অভাব, অভাব যানবাহনেরও। সঙ্গের লোকের সংখ্যাও ক্রমক্ষীয়মান। হমীদা স্বামীর সঙ্গে চলেছেন ভারী শরীরটি নিয়ে। ধূ ধূ মরুভূমি। উত্তপ্ত বালুকা। তারই মধ্যে যেতে হচ্ছে। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অবসন্ন। তারই মধ্যে খবর আসে শত্রুসৈন্য আসছে। চমকে চমকে ওঠেন হমীদা, স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ভয় মোচন করেন।

জল, জল, জল। চারিদিকে জলের জন্য হাহাকার। একটুর সন্ধান যেই পাওয়া গেল, অমনি শোনা গেল সাবধান, আবার আসছে মালদেব। পালাও, পালাও।

আবার চলা। একটা কুয়ো সামনে। তার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল অনেকে। মরে গেল দড়ি ছিঁড়ে কুয়োয় পড়ে কেউ কেউ। বড় জলাধারে জল খেয়ে কত উট-ঘোড়া মারা গেল তার হিসেব নেই। দুর্ভাগ্য, দুর্ভোগ বেড়েই চলে। শেষে সুন্দরী উমরকোটে পৌছলেন হমীদা। একেবারে অবসন্ন।

অপূর্ব সৌজন্য দেখালেন সেখানের রাণা (কি নাম?—পস্মিম? পরসাদ, প্রসাদ? অথবা বীরীশাল?) পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন। সকলের জন্য দিলেন মনোরম আসন আর আহার্য। স্বস্তি পেলেন হমীদা। আর বুঝি যুঝতে পারেন না এই আসন্নপ্রসবা বালিকা বধূটি। রাণা মহাসম্মানে তাঁকে তাঁর নিজস্ব দুর্গটি খালি করে দিলেন অশেষ সৌজন্যে। হমীদা যেন প্রাণে বাঁচলেন।

হুমায়ুন ইতিমধ্যে রাণার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছেন তাঁর ইতিকর্তব্য। সেইমতো প্রায় সাত সপ্তাহ আরামে কাটিয়ে হুমায়ুন ভক্করের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক চারদিন পর ১৫ অক্টোবর ১৫৪২ তারিখে হমীদা একটি সন্তান প্রসব করলেন ঐ রাণার আতিথ্যে দু মাস

থাকার পর। এই সন্তানই মোগল বংশের শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পুরুষ মহামতি আকবর।

দিনটি ছিল শুভকর নানাদিক থেকে। চন্দ্র প্রবেশ করেছে সিংহ রাশিতে। আবুল ফজল বলেছেন এমন শুভলগ্ন হাজার বছরে হয়তো এক বার ঘটে। এর আগেই নাকি সম্রাট অপূর্ব এক স্বপ্ন দেখেছিলেন ১০ জুলাই ১৫৪০-এর রাতে। হমীদার ভ্রূযুগলকে নাকি দর্পণের মতো উজ্জ্বল দেখতে লাগতো সে সময়ে। কিন্তু এক ভীষণদর্শন ধাত্রীকে সন্তান প্রসব করাতে দেখে হমীদা নাকি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

হুমায়ুন তখন উমরকোট থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে এক বিশাল পুকুরের তীরের বাগানে ছাউনি পেতেছেন জুন যাবার পথে। সেলনের সেই দর্পণ বাগে শুভ খবর নিয়ে গেলেন তারদী বেগ। তারদী বেগের সমস্ত পুরনো অপরাধ মাপ হয়ে গেল। আর সেই পুরনো স্বপ্নানুসারে পুত্রের নাম রাখলেন আকবর। কিছু সম্বল নেই। সম্বল বলতে আছে মাত্র ২০০টি রূপোর শাহ্রূখ। আর ছিল এক পাত্র মৃগনাভি কস্তুরী। একটি পিরিচের উপর রেখে সেটি ভেঙে সঙ্গীদের সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। আর বললেন—'আমার পুত্রের জন্মদিনে এর বেশি কিছু আর দিতে পারলাম না। শুধু বলুন আমার পুত্রের যশসৌরভ যেন এই কস্তুরীর মতোই দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়।'

হমীদা অবসাদগ্রস্ত প্রসবের পর। শুধু ভাবেন, মোগল বংশের পরবর্তী সম্রাটের তিনি জন্ম দিলেন। কিন্তু সেই গর্বিতা মাতাকে আদর জানাবার জন্য তাঁর স্বামী এলেন কই!

হুমায়ুন এদিকে এগিয়ে চলেছেন তত্ত থেকে জুনের দিকে সেই সন্ধ্যার পর থেকেই। এদিকে নবজাতক জলাল-উদ্-দীন মুহম্মদ আকবরকে বুকে নিয়ে হমীদা বানু বেগম আরও ছত্রিশ দিন রাণার আশ্রয়ে থেকে এগোতে লাগলেন স্বামীর উদ্দেশ্যে ২০ নভেম্বর তারিখে। আকবর তখন মাত্র পাঁচ সপ্তাহের শিশু। পঞ্চান্নদিন যখন তাঁর বয়স, সেদিন ৮ ডিসেম্বর ১৫৪২ তারিখে আকবর মায়ের সঙ্গে বাবার কাছে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে এলেন অনেকগুলি ধাত্রীমাতা।

প্রায় ন' মাস জুনে থাকার পর হুমায়ুন শিবিরপথে কান্দাহারের দিকে এগোলেন। খবর পেয়ে ধেয়ে এলেন বৈমাত্রেয় ভাই অস্করী (গুলরুখের সন্তান)। হুমায়ুনও খবর পেয়ে ঘোড়ায় চেপে মক্কার পথে সিয়েস্তানের দিকে রওনা হলেন। ফার্লং খানেক এগিয়ে হমীদাকেও আনতে পাঠালেন। একটাও বাড়তি ঘোড়া নেই। তারদী বেগ সুযোগ বুঝে বললেন নিজের ঘোড়া দিতে পারবেন না। কিন্তু হুমায়ুনকে পালাতে হবেই। হমীদাকে সামনে বসিয়ে নিজের ঘোড়াটিতেই পিছনে বসে ছোটালেন ঘোড়া। শিশুপুত্র আকবরকে নেবার সময় পর্যন্ত হল না। আশ্চর্য জনক-জননী! এ কি দৈহিক ভালবাসার মাত্র আর্কষণ! নিজের জীবনের জন্য পুত্রকে বির্সজন!

হায় রে, একবছরের অসহায় শিশুপুত্র আকবর জানলেন না পর্যন্ত তাঁর বাবা-মা কি নিষ্ঠুরতম ব্যবহারটাই না করে গেলেন। সেদিন ১৫ অক্টোবর ১৫৪৩ খৃঃ আকবরের জন্মদিন। দ্বিতীয় জন্মোৎসব পালিত হল মাতা-পিতার পরিত্যাগের মধ্যে। শুধু কয়েকটি ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে তিনি শিবিরে পড়ে রইলেন।

শত্রু অস্করীকে শত ধন্যবাদ। তিনি এসে দেখলেন—পাখী উড়ে গেছে। শুধু ধাত্রী মাহম অনগ, জীজী অনগ আর আত্‌কা খানের তত্ত্বাবধানে পড়ে আছে শিশুপুত্র আকবর। আশ্চর্য ঔদার্যে ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে নিয়ে তিনি কান্দাহারের প্রাসাদে এনে নিজের স্ত্রী সুলতানম্ বেগমের হাতে। কি পরম উদারতায় আর মাতৃস্নেহে এই নারী আকবরকে স্তন্যদানে পূর্ণ করেছেন। হমীদা যা পারেন নি গর্ভধারিণী হয়ে, সুলতানম্ বেগম তাই পারলেন। অনেকদিন পর, আকবরের বয়স তখন ৩ বছর ২ মাস ৮ দিন—হুমায়ুনের সঙ্গে পুত্রের মিলন ঘটল।

আর মায়ের সঙ্গে আকবরের? সে এক চমৎকার আখ্যান। সবাই মিলে পরীক্ষা করতে চাইলেন এক বছর বয়সে যে শিশুটি মায়ের কাছছাড়া, কোলছাড়া হয়েছিল, সে তার মাকে চিনতে পারে কি না—তা দেখা যাক। হুমায়ুনের হারেমে অন্যসব মেয়েদের মাঝে গিয়ে বসেছেন হমীদা খুব সাধাসিধে পোশাকে, যাতে তাঁকে আলাদা করে না চেনা যায়।

আবুল ফজল লিখেছেন—একটুও ইতস্ততঃ না করে, একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বা ভুল না করে শিশু আকবর আস্তে আস্তে গিয়ে মায়ের কোলে বসলেন। আর হমীদার মাতৃস্নেহ উথলে পড়ছিল—একেবারে পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। সে এক চোখে জল আসা অভূতপূর্ব মিলন দৃশ্য। আবেগে, আক্ষেপে, অনুশোচনায়, আনন্দে হমীদা তখন পাগল-প্রায়।

হমীদা বানুর একটি কন্যাসন্তানও জন্মেছিল যখন তাঁরা সবজওয়ারে ছিলেন (১৫৪৪)। কিন্তু হমীদার সব ভালবাসা তখন আকবরের প্রতিই ধাবিত। এই পুত্রই তাঁর জীবনের সূচনায় এবং অন্তিম পর্বে স্বপ্ন হয়ে ছিল। তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ। আকবর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মা হমীদা খবর পেয়েছেন। এখন তিনি মাকে দিয়েছেন সম্মানের উপাধি। হমীদা এখন মোগল সাম্রাজ্যে মরিয়ম মাকানী নামেই পরিচিত। মা হমীদা পুত্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই সেই বয়সে ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদ ছেড়ে পুত্রের কাছে ভেরা শিবিরে এসে দেখা করেছেন। কোমল হাতে পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে রোগমুক্ত করেছেন।

আবার ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের দারুণ শীতে পুত্র আকবর বলনাথ পর্বতে যোগীদের কাছে তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন শুনে সেই বয়সেই রাজধানী থেকে রোহটাস-এ পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তীর্থভ্রমণে গেছেন।

আসলে হমীদার মধ্যে একটা সাধুচিত্ত বাস করত। তীর্থভ্রমণে পরম আগ্রহ ছিল তাঁর। সেজন্য গুলবদন বেগম যখন মক্কা যাত্রা করলেন, তিনিও পুত্রের বিশেষ অনুমতি নিয়ে অনেক দুঃখভোগ করে বহুপ্রার্থিত তীর্থ মক্কা দর্শন করে এসেছিলেন (এ বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য 'গুলবদন' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

অথচ অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল অসহিষ্ণুতা দেখে আমরা বিস্মিত হই। খৃষ্টানদের সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁর একটা জাতক্রোধ ছিল যেন। পুত্র আকবরকে এ নিয়ে কম অশান্তি ভোগ করতে হয়নি।

পুত্র ছাড়া তাঁর জীবনে স্বামী এবং পৌত্র সলিমের স্থান ছিল উল্লেখ-

নীয়। স্বামীর সমস্ত সুখদুঃখের অংশভাগিনী হমীদার জীবন বাস্তবিকই আদর্শের। হুমায়ুন একবার অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, হমীদা আদর করে বেদানার রস স্বামীর মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিতেই তিনি ফিরে পেয়েছেন পূর্ণ চেতনা। ইরানের শাহ্-এর কাছে বেড়াতে গিয়ে স্বামীর পাশে পাশে থেকে কখনও দেখেছেন মৃগয়া। আবার পরম চাতুর্যে ভৃত্য কূকের চৌর্যকার্যের আদ্যোপান্ত রহস্য করেছেন উন্মোচিত।

কখনো গেছেন স্বামীর সঙ্গে রাঁওয়াজ ফুল ফোটার পরম মুহূর্তগুলি দর্শনে, কখনো গেছেন কমলা বাগিচাগুলোতে বেড়াতে স্বামীর সঙ্গে। পরম আদরে স্বামীর সোহাগিনী হয়ে দিনগুলো তাঁর কেটেছে।

ভালবাসতেন নাতিটিকে দারুণ। পিতা-পুত্রে তখন দারুণ মনান্তর। সেলিম বিদ্রোহী। আকবর ঠিক করেছেন এই বিদ্রোহী পুত্রকে চরম শাস্তি দেবেন। ঠাকুমা কি তাই সহ্য করতে পারেন। মধ্যস্থতা করে সব মিটিয়ে দিলেন। তাঁরই কথায় সেলিম গিয়ে পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

অথচ এই সেলিমই একদিন এই মরিয়ম মাকানীকে একটু ভদ্রতা পর্যন্ত দেখালেন না। তিনি তখন আগ্রায়। কি নিদারুণ দুঃখই না পেয়েছিলেন সেদিন। নাতি কাছে এসেছে শুনে দেখা করতে গেলেন আর সেই নাতিই নাকি মৃগয়া ছেড়ে ঠাকুমা আসছেন শুনে নৌকো করে পালিয়ে গেল!

এখন মনে হয়, হমীদা যে নিজের ভাগ্যকে মোগল রাজবংশের সঙ্গে জড়াতে চান নি, তা-ই হয়তো ভাল হত। বুকে সমস্ত ভালবাসা নিয়ে স্বামী-পুত্র-পৌত্র আত্মীয়-স্বজন সকলকেই কাছে পেতে চেয়েছেন। পরিবর্তে ভালবাসা-সম্মান যে পান নি তা নয়, কিন্তু দুঃখ পেয়েছেন তুলনামূলকভাবে বেশি।

স্বামী সেই কবে ছেড়ে চলে গেছেন। পুত্র মাথায় রেখেছেন বটে, কিন্তু অমান্যও তো কমবার করেন নি। আকবর চাইতেন মা যেন কোনপ্রকারেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নাক না গলান। একবার পর্তুগীজদের একটা দল একটা কোরানকে কুকুরের গলায় বেঁধে অপমান করায়

হমীদা পুত্রকে বলেছেন একটা বাইবেলকে গাধার গলায় বেঁধে দিতে। আকবর না শুনে ভান করেছিলেন হয়তো, এমনকি লাহোরের দরবার না তুলে দিয়েও হয়তো ঠিক করেছিলেন, কিন্তু দুঃখিত মনে হমীদা ঘর-সংসারে মন দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে আকবর যখন দারুণভাবে দুর্ঘটনায় পড়েন, হমীদা বলে পাঠালেন—তুমি কিছুদিন বিশ্রাম নাও পুত্র। আকবর উদ্ধতভাবে বলেছিলেন আমি আরামে থাকব আর বিশ্ব কষ্ট পাবে তা হয় না। বড় দুঃখ পেয়েছিলেন সম্রাট-মাতা। তবে সবচেয়ে দুঃখ পেলেন যখন তিনি পুত্রকে পৌত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে নিষেধ করলেন।

আকবর যখন এই অনুরোধ অমান্য করে এগোতে লাগলেন তখন যেন এই বৃদ্ধার বুকে শেলাঘাত হল। তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খবর শুনে আকবর আগ্রাতে ফিরে এলেন। হমীদা তখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছে। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে সাতাত্তর বছর বয়সে দুঃখ পেতে পেতে হমীদা চলে গেলেন।

যাবার পরেই এল যে সম্মান, সম্মানিতের কাঁধে চড়ে আগ্রা থেকে মৃতদেহের দিল্লী আগমন—তাও বুঝি আপাত। হমীদা চেয়েছিলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ সবার মধ্যে সমান করে ভাগ করে দেওয়া হোক। আকবর —লোভী আকবর একাই সবকিছু আত্মসাৎ করে হমীদার শেষ ইচ্ছা-টুকুও পূর্ণ করলেন না। মোগল-হারেমের সবটুকুই বিলাসিতা প্রমোদ আর নিরাবিল জীবনের ইতিহাস নয়। হমীদার জীবন তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আকবরের অন্দরমহল

জলাল-উদ্-দীন মুহম্মদ আকবর শাহ যখন সিংহাসনে গিয়ে বসলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। জন্ম ১৫৪৩, রাজ্যলাভ ১৫৫৬—সেই বিখ্যাত দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধের অবসানে।

তেরো বছরের বালক হলেও বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতায় পরিণত। বয়সটা অবশ্য বিয়ে করার উপযুক্ত নয় ঠিকই কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছিল। সে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা। আকবরের বয়স তখন কতো হবে? বছর আটেকের মতো। অবশ্য বিয়ের কথাই মাত্র হয়েছিল, বধূ বাগদত্তা মাত্র হয়েছিলেন। আর বধূ সন্ধানের জন্য হুমায়ুন বেশি দূরেও যান নি। এমনকি বাল্যপ্রণয় ঘটে থাকা বিচিত্র না হলেও প্রয়োজন ছিল না। আকবর, ভারতের মোগল বংশের অন্যতম কৃতী সম্রাট, প্রথম বিবাহ করেছিলেন এই বাগ্‌দত্তা বধূটিকেই। নাম রুকিয়া বেগম। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী 'জাহাঙ্গীরনামা'য় লিখেছেন 'তিনি আমার পিতার সম্মানীয়া পত্নী (প্রথম বিবাহিতা পত্নী)।'

কে এই রুকিয়া বেগম যাঁর সঙ্গে সেই বাল্যবয়সেই আকবরের বিবাহ স্থির হয়েছিল? আকবর তো সামান্য পাত্র নন—পাদশাহ হুমায়ুনের প্রিয়তম পুত্র তিনি। রুকিয়া হিন্দালের কন্যা। হিন্দাল কে? হিন্দাল হলেন হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাই, বাবর আর দিলদার বেগমের সন্তান, গুলবদনের সহোদর ভাই। তাঁরই মেয়ে রুকিয়া। আকবরের সঙ্গে সম্পর্কে আপন পিসতুতো বোন। তাঁরই সঙ্গে প্রথম বিবাহ হল আকবরের।

কিন্তু দুর্ভাগ্য রুকিয়ার। স্বামীকে তিনি কোনো সন্তান উপহার দিতে পারলেন না। তাই বুঝি তাঁর পাটরাণীও হয়ে উঠতে পারলেন না। কিন্তু আকবর স্ত্রীর এই মনোবেদনা বুঝতে পারতেন। পারতেন বলেই যে মুহূর্তে পৌত্র যুবরাজ খুর্‌রমের (পরে সাজাহান নামেই পরিচিত ও খ্যাত) জন্ম হল—সানন্দে এবং সহর্ষে তিনি পৌত্রটিকে লালন-পালনের জন্য রুকিয়ার শূন্য ক্রোড়ে এনে দিলেন।

কিছুদিন আগে থেকেই রুকিয়া জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্যগণনা করিয়ে জেনেছিলেন—তাঁর ভাগ্যে মা হওয়ার সৌভাগ্য নেই। জ্যোতিষী গোবিন্দ অবশ্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—জাহাঙ্গীরের ঔরসে

মানমতীর গর্ভে যে সন্তানটি এসেছে, সেটি হবে পুত্রসন্তান। তুমিই তাকে পালিতপুত্র হিসেবে নিয়ে মানুষ-টানুষ করো। সেই-ই হবে তোমার মাতৃত্বের উপকরণ।

রুকিয়া স্বামীর কাছে সাদরে তাঁর নিয়তির কথা জানিয়েছিলেন। আকবর এই সব ভাগ্যগণনায় বিশ্বাসী ছিলেন খুব। স্ত্রীকে আদর করে বলেছিলেন—তাই হবে গো, তাই হবে।

যথাসময়ে দেখা গেল তাঁর নাতিই জন্মগ্রহণ করেছে। আকবরের যতো আনন্দ, তার চেয়ে রুকিয়ার আনন্দ শতগুণ। রুকিয়াকে কেউ তো 'মা' বলে ডাকবে। ছ'দিন পার হতেই ১১ জানুয়ারী ১৫৯২ তারিখে জাহাঙ্গীর ডেকে পাঠালেন বাবাকে। তিনি এলে তাঁকে বললেন—বাবা, এই সন্তানের নামকরণ করুন। আকবর নাম দিলেন 'খুর্‌রম'। এই শব্দের অর্থ 'আনন্দোচ্ছল'। তারপরেই পত্নী রুকিয়ার হাতে তুলে দিলেন নবজাতককে। চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সেই প্রথম পেলেন মাতৃত্বের অপরোক্ষ স্বাদ। জাহাঙ্গীর ঠিকই লিখেছেন—'খুর্‌রম যদি তাঁর নিজের ছেলেও হতো—তার চেয়েও হাজার গুণ ভালবাসা সে তাঁর কাছে পেয়েছিল।'

জাহাঙ্গীরও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সাখুলি খাঁর আগ্রাতে একটি চমৎকার বাগান ছিল। তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়ে বাগানটিকে দান করেছিলেন তাঁর এই বিমাতাকে। এই বাগানের বাড়িটিতে বাস করতে করতেই একদিন হারালেন স্বামীকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তারপরে আরও ২১ বছর বেঁচেছিলেন এই সন্তানহীনা বিধবা রাণী। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে থাকতেই প্রায় চুরাশি বছরের পরিণত বয়সে অবীরা এই নারীর মৃত্যু ঘটল ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে।

তেরো বছর বয়সে যে কিশোর সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করতে পারেন, পনেরো বছর বয়সে তাঁর জীবনে যৌবনের সমারোহ আসা অসম্ভব নয়। অতএব আকবরও তাঁর পনেরো বছরের বয়সে মদনের উপস্থিতি অনুভব

করেছিলেন আবশ্যিক ভাবে। ঘরে তাঁর বালিকা-বধূ এখন কিশোরীটি হয়ে উঠেছেন বটে, আর সে তো তাঁর সমবয়সীও। কিন্তু পনেরো বছরের আকবর সম্রাটের (সত্যি বলতে আকবর তখন সাড়ে চোদ্দ) অন্দর-মহলে একটি মাত্র নারী থাকবে, এটা খুবই অশোভন। এ হেন সময়ে পাত্রীও উপস্থিত হয়ে গেলেন।

হুমায়ুনের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন কামরান। তিনি বিয়ে করেছিলেন আবদুল্লা খান মুঘলের ভগ্নীকে। এই আবদুল্লা খানের একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। আকবর তাঁকে বিয়ে করে বসলেন ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে। দারুণ অখুশী হয়ে উঠলেন তাঁর অভিভাবক-কল্প সেনাপতি বৈরাম খান। কারণ আবদুল্লা খান সাহেবের সঙ্গে তাঁর একটা বৈরী ভাব ছিল। কিন্তু তাতে মদনদেবের অপ্রতিহত গতি তো বাধা পাবার কথা নয়। অতএব আকবরের ঘরে এলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। কিন্তু হারিয়ে গেলেন তিনিও নিঃসন্তান বধূদের দলে।

এরপর হিসেব নেই তাঁর পত্নী আর উপপত্নীদের সংখ্যার। কে রাখে তার হিসাব? আবুল ফজল জানিয়েছেন আকবরের হারেমে পাঁচ হাজার রমণী ছিল। তিনি আবার কৌতুক করে এও বলেছিলেন যে ঐ পাঁচ হাজার রমণীকে বশে রাখতে হলে যে কূটনীতি আর বিচক্ষণতার প্রয়োজন, তার পরিচয় দিয়ে মহামান্য সম্রাট নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিকেই আরও শাণিত করেছিলেন।

আকবরের হারেমের আরও খবর চান? ঐ পাঁচ হাজার মেয়ে যেখানে বাস করতো, আসলে সেটা একটা পুরোদস্তুর শহর ছিল। সরাইখানার মতো বা ইংরেজি ডরমেটরির মতো তাঁরা এক জায়গায় শয়ন করতেন না। প্রত্যেকেরই ছিল আলাদা আলাদা ঘর। ঘর মানে বিলাসকক্ষ। ভাবুন তো ব্যাপারখানা কি রকম! এই পাঁচ হাজার রমণীদের কয়েকটি শ্রেণীতে তিনি ভাগ করে এক একজন মহিলা রক্ষী, যাদের নাম ছিল দারোগা—তাদের অধীনে রাখতেন। বিশাল খরচ হত —তার হিসেব রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন করণিকেরা।

অন্দরমহলের ভিতরের ঘরগুলি পাহারা দিতো সশস্ত্র মহিলা রক্ষীর

দল। এর পরেই থাকতো খোজা-প্রহরীরা। তারপরে থাকতো বিশ্বস্ত রাজপুত প্রহরীর দল। বেশ একটু দূরে সৈন্যরা থাকতো মোতায়েন। এমনি এক নিশ্ছিদ্র প্রহরার অতন্দ্র বিন্যাসের মধ্যে আকবর মেতে উঠতেন উপভোগের মত্ততায়। পাশা খেলায় জীবন্ত ঘুঁটি তিনি পছন্দ করতেন। উলঙ্গ উপপত্নীগুলোকে ব্যবহার করতে ঘুঁটি হিসেবে আর তাই দিয়ে চলতো তাঁর খেলা।

অতএব হিসেব করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এঁদের কোনো ইতিহাস নেই। থাকতেও নেই। এরা শুধু সম্রাটের নর্মসহচরী, ভোগের উপকরণ, বিলাসের সামগ্রী। এদের মন থাকতে নেই, লজ্জা থাকতে নেই, জীবন থাকতে নেই। সম্রাটের আকাঙ্ক্ষা পূরণই এদের লক্ষ্য। পরিবর্তে আছে রুটির নিরাপত্তা। অবশ্য জীবনের নিরাপত্তা যে সর্বদা থাকতো, তা নয়। না-পসন্দ হলেই হয় প্রত্যাখ্যান আর দূরীকরণ, নয় তো 'গর্দান লেও।'

তবুও কিছু পত্নী-উপপত্নীর হিসাব ইতিহাস রেখেছে। পুত্র জাহাঙ্গীরও কারও কারও কথা উল্লেখ করেছেন। পত্নী-উপপত্নী নির্বিশেষে। আসলে এতে তো লজ্জা নেই, আছে গৌরব। অতএব পিতার 'গৌরব', পুত্র ব্যাখ্যান করবে—এতে আশ্চর্য কি! এঁদের অনেকে আকবরের পুত্র-কন্যার মা। উপপত্নীর গর্ভে জন্মেও এঁরা সম্মানিত। ইতিহাসে পাওয়া কিছু স্ত্রী ও রক্ষিতার কথা এবারে আমরা উল্লেখ করি। বলা প্রয়োজন এঁদের প্রায় সকলেই আকবরের মনের সাথী হতে পারেন নি। যাঁরা পেরেছিলেন তাঁদের কথাও বলবো। আগে বলি বিবাহিত সম্রাজ্ঞীদের কথা।

প্রিয়তমা মহিষী (প্রিয়তম পুত্র জাহাঙ্গীর-সলীমের গর্ভধারিণী) মানমতীর কথা আমি পরে বলছি। তিনি ছাড়া আরও অনেক রাজপুত রমণী আকবরের হারেমের শোভা বৃদ্ধি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিকানীর রাজা এবং জয়শল্মীরের রাজা তাঁদের কন্যাকে বাদশাহের ঘরে পাঠিয়েছিলেন আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে।

বিবাহ করেছিলেন তিনি খান্দেশের অধিপতি মিরন মুবারক শাহের

কন্যাকেও। তারিখটা ছিল ১৫৬৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো একটি দিন। বিয়ে করেছিলেন জনৈক আরব শাহের কন্যা কাসিমা বানুকে। সে আরও পরের ঘটনা। বিয়ে করেছিলেন বিবি দৌলত সাদেকে। আকবরের পুত্র দানিয়েলের জন্মের পর বিবি দৌলত সাদের গর্ভে আকবরের একটি কন্যার জন্ম হয়। তার নাম ছিল সকরুণ-নিসা বেগম।

এই স্ত্রীটিকে আকবর ভালবাসতেন খুব। ভালবাসতেন এই কন্যাটি-কেও। নিজের কাছে রেখে মেয়েটিকে মানুষ করেছিলেন তিনি। জাহাঙ্গীরও সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন এই বোনটিকে। ছোট শিশুদের বুক টিপে একফোঁটা দুধ বের করার যে রীতি আছে, সেই অনুসারে সকরুণ-নিসার বুক টিপে দুধ বের করা হলে পিতা আকবর জাহাঙ্গীরকে বলেছিলেন—'বাবা, তুই এই দুধ খা, যাতে তোর এই বোনকে মায়ের মতো মনে হবে।'

দৌলত সাদের গর্ভে আকবরের আরও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সে তার দিদির বিপরীত স্বভাবের। ঠিক জাহানারা আর রোশিনারার মতো। এর নাম রেখেছিলেন আকবর—আরাম বানু বেগম। একটু রাগী, একটু উত্তেজনাপ্রবণ। তবুও আকবর তাকে ভালবাসতেন খুব। তার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করেই সম্রাট পিতা সম্রাট পুত্রকে বলেছিলেন—'আমি যখন থাকবো না, এর সব দোষ ক্ষমাঘেন্না করে একে ভালবাসিস যেন।' জাহাঙ্গীরকে সে কথা রাখতে হয় নি। আল্লাহ-ই এই দুরন্ত অভিমানী মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কুমারী অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছিল আরাম বানু বেগমের। বিবাহিত সকরুণ-নিসা কতই না কেঁদেছিলেন বোনের মৃত্যুতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

আকবর বিয়ে করেছিলেন দুই বিধবা রমণীকেও। একজন আবদু-ল-ওয়াসার বিধবা স্ত্রী এবং অন্যজন পিতৃব্য-কল্প বৈরামখানের বিধবা সালিমা সুলতান বেগম। ১৫৬১ খৃস্টাব্দে বৈরামখানের মৃত্যুর পর আকবর যে সালিমাকে বিয়ে করে ঘরে আনলেন আসলে তিনি ছিলেন হুমায়ুনেরই এক ভাগ্নী। সেদিক থেকে ইনিও আকবরের এক পিসতুতো

বোন। ঘরের মেয়ে নিজের ঘরেই এলেন।

সালিমা আকবরের মনের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রাজ্যনীতি নির্ধারণে এই মহিলার কিছু ভূমিকাও ছিল। এক সময়ে জাহাঙ্গীরকে তিনি নানাভাবে নিয়ন্ত্রণও করেছিলেন। আকবর এই পুত্রের বিরুদ্ধে গেলে ইনিই হমীদা বানুর নিরাপদ তত্ত্বাবধানে রেখে এই পুত্রকল্প ভবিষ্যৎ সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন আগ্রা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে।

আকবরের প্রথম হিন্দু পত্নী বিষয়ে সব শেষে বলার আগে আমরা তাঁর অন্তত তিনজন উপপত্নী বিষয়ে যৎসামান্য তথ্যাদি নিবেদন করার সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু কেন আকবর এতগুলি বিবাহে ও উপপত্নীতে নিরত হয়েছিলেন তাও ভেবে দেখার ব্যাপার। পুত্রসন্তানের জন্য আকবর একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন যৌবনের প্রথম উদ্গম থেকেই। দুর্ভাগ্য তাঁর—কোন মহিষীই তাঁকে তুষ্ট করতে পারেন নি। তাঁর মহিষীরা সন্তানের জন্ম দেন বটে, কিন্তু সকলেরই শিশুমৃত্যু ঘটে। একটি জীবিত পুত্রের জন্য আকবরকে তাঁর সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সে এক কুসংস্কারের ইতিহাস অথবা সে এক প্রার্থনার জোবানবন্দী। সে কথা বলছি পরে।

তার আগে বলি আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের জন্ম হয়েছিল জুন ১৫৭০ তারিখে তার এক উপপত্নীর গর্ভে। জাহাঙ্গীর এর নাম বলেছেন সা-মুরাদ। পাহাড়ী এলাকা ফতেপুরে (সিক্রি) এর জন্ম হয়েছিল বলে আকবর একে ডাকতেন পাহাড়ী বলে। মদ্যপ ও অনাচারী এই পুত্র মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মারা যায়।

তাঁর তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের জন্মও এক রক্ষিতার গর্ভে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের দশই সেপ্টেম্বর তারিখে। এই নামকরণের কারণ এই পুত্রটি জন্মেছিলেন আজমীরে খাজা মুইনুদ্দীন চিস্তির পবিত্র সমাধিস্থানের পীর সেখ দানিয়ালের গৃহে। এসব সাধুসন্তের কথা পরে আরও বলছি।

আরও এক উপপত্নীর গর্ভে আকবরের প্রথমা কন্যা খানাম সুলতানের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের (ঠিক করে বলতে গেলে সলীম

বলাই উচিত আমাদের) চেয়ে তিন মাসের ছোট—জন্ম হয় ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এই কন্যাটিকে লালনপালনের ভার নেন আকবরের মা, কন্যার পিতামহী মরিয়ম মাকানি (হমীদা বানু বেগম)। আকবরের গৃহ এসব সন্তানের আগমনে অবশ্যই প্রত্যাশিত আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তবে এই আস্বাদ তাঁকে প্রথম এনে দিয়েছিলেন যিনি, তিনিই আকবরের প্রথম হিন্দু মহিষী, এক রাজপুত রমণী। আকবর তখন পুত্র-সন্তানের জন্য উন্মাদপ্রায়। দুটি সন্তান তাঁর জন্মেছিল বটে কিন্তু তারা বরণ করেছিল অকালমৃত্যু। সেজন্য মনে মনে তিনি ভাবছিলেন কোনো সাধুসন্ত পীর ফকিরের কাছে আশ্রয় নিলে হয়তো তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে।

এই রকম যখন ভাবছিলেন, তখন একদিন ফতেপুর সিক্রিতে মৃগয়া করতে গিয়ে আগ্রা থেকে মাইল আটেক পশ্চিমে মিধাকুর নামে একটি গ্রামে একদল হিন্দুর মুখে একটা কাওয়ালি গানের বিষয়বস্তু শুনে তাঁর জীবনপথের যেন নির্দেশ খুঁজে পেলেন। গানটিতে ছিল আজমীরের প্রয়াত পীর খাজা মইনুদ্দীন চিস্তির প্রশংসাবাণী। আকবর কৌতূহলী হয়ে গানটি শুনলেন। আর তার পরেই স্থির করলেন তিনি খাজা সাহেবের চিস্তিতে যাবেনই।

সেইমতো ১৫৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি ছোট একদল সঙ্গীকে নিয়ে রওনা হলেন। ধাত্রীমাতা মাহম অনগকে বলে গেলেন—তুমি হারেমের সবাইকে নিয়ে মেওয়াটের পথ ধরে আমাকে অনুসরণ কর। যেতে যেতে টৌডাতোন আর খরণ্ডীর মাঝখানে কলাওলী পৌঁছলে অম্বরাধিপতি রাজা বিহারীমল (কেউ কেউ বলেছেন ভরমল) দূত পাঠিয়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। আকবর অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গনের-এর কাছে (এখনকার জয়পুর শহরের সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) উভয়ের দেখা হল।

রাণা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে সম্রাটের বিবাহের প্রস্তাব করলেন। সম্রাট, সন্তান-পিপাসু সম্রাট,

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলেন আর রাণাকে বললেন—আপনি এখনই অম্বরে ফিরে গিয়ে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করুন।

এই বলে আকবর খাজার দরগায় ঘুরে এলেন। ফেরার পথে তিনি সম্ভর-এ থামলেন। এই শহরেই দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে বিহারীমলের কন্যার বিয়ে হয়ে গেল আকবরের—একজন হিন্দুনারীর সঙ্গে এক মুসলমান সম্রাটের বিধিসম্মত বিবাহ! কি নাম কন্যার? কেউ বলেন নি। আশ্চর্য! যাই হোক ধুমধাম হল খুব আর রাণা নানা মহার্ঘ পণ দিয়ে সম্রাটকে করলেন সম্মানিত। মাত্র একদিন বাস করলেন তিনি সম্ভর-এ। তারপর নববধূকে আর অন্যান্য রমণীদের নিয়ে রওনা হলেন আগ্রার দিকে। রণথম্ভোরে গিয়ে রাণার পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়স্বজনেরা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাণার নাতি মানসিংহ (এঁরই পিসিমা হলেন আকবরের এই নববধূটি) সম্রাটের দরবারের অন্তর্ভুক্ত হলেন। বিয়ের পর বিহারীমলের কন্যা প্রথম আগ্রার হারেমে প্রবেশ করলেন ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫৬২ তারিখে।

কিন্তু বছর না ঘুরতেই সন্তান উপহার দিতে পারেন নি এই রাজ-পুতানী বেগম। সেজন্য আরও সাত বছরেরও বেশি কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল আকবরকে।

সুতরাং আরও অনেকবার আকবরকে পীর-ফকিরদের আশ্রয়ে যেতে হয়েছে, প্রার্থনা জানাতে হয়েছে সন্তানের জন্যে। সে সময়ে দরবেশ সেখ সেলিম জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করে এসে আগ্রার সন্নিকটে সিক্রির কাছে এক পাহাড়ের উপর বাস করছিলেন। আকবর বার বার এঁর কাছে আসতে লাগলেন। একদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দরবেশকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন—তাঁর কি কোনো পুত্রসন্তান হবে না? হলে কটি সন্তান হবে। সেখ জবাব দিলেন—ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার তিনটি পুত্রসন্তান হবে। শুনে একমুখ উজ্জ্বলতা নিয়ে সম্রাট বললেন—তা যদি হয় তবে আমার শপথ—আমার প্রথম পুত্র জন্মালে তাকে আমি তোমার নামে সঁপে দেবো। সেখ আকবরকে অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—তোমার পুত্র জন্মালে আমি আমার নিজের নাম তাকে দেবো।

এমন সময় জানা গেল রাজপুতানী বেগম সন্তানসম্ভাবিতা। আকবর একটুও দেরী না করে মহিষীকে সেখের আবাসে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেই জন্ম হল আকবরের প্রথম জীবিত থাকা পুত্রের—যার নাম হল মহম্মদ সেলিম (যিনি পরে নিজের নামকরণ করেন নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীর পাদশাহ)। সেলিম নামকরণ করা হল ঐ সেখের ইচ্ছা অনুযায়ীই। আকবর অবশ্য পুত্রকে সর্বদা ডাকতেন 'সেখ বাবা' নামে। আগ্রা শহরটিকে আকবরের মনে হল বড্ড অপয়া। তাই সিক্রিতেই নিজের নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। রাজপুতানী বেগমের আদরের আর পরিসীমা রইল না।

সুলতান সেলিম মীর্জার যেদিন জন্ম হল, সেদিন আকবর ছিলেন ফতেপুর সিক্রি থেকে দূরে আগ্রায়। সেখ সালিমের জামাই সেখ ইব্রাহিম গিয়ে তাঁকে সুসংবাদ জানিয়ে এলেন। আনন্দে উদ্বেল হয়ে আকবর যেন রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিলেন। বন্দীরা পেলেন মুক্তির ফরমান। বিশাল বিশাল ভোজ উৎসব হল। কবিরাও পেলেন নগদ অর্থ। একজন কবি—তাঁর নাম খাজা হুসেন, সেলিমের জন্ম নিয়ে দারুণ একটা গাথা-কবিতা রচনা করলেন। আকবর তা পাঠ করে খুশি হয়ে দু লক্ষ তঙ্কা তাঁকে উপহার দিয়ে বসলেন।

শুধু তাই নয় সম্রাট নিজে হেঁটে খাজা মইনুদ্দীন চিস্তির মুরাহু-ল্-অনওয়র কুত্‌বু-ল ওয়াসিলীন পর্যন্ত গেলেন। প্রতিদিন তিনি ৮ ক্রোশ করে হাঁটতেন। একই সঙ্গে আল্লাহ্ এবং বেগম—দুজনের কাছেই সম্রাট কৃতজ্ঞ রয়ে গেলেন। বেগম যে তাঁকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে সাহায্য করেছেন! হিন্দুসমাজের প্রতিই হয়তো তিনি কিছু সময়ের জন্য কৃতজ্ঞ থেকে গেলেন। আকবর গর্বিত। গর্বিত তাঁর এই স্ত্রীও।

শুধু কি সম্রাটের পত্নী হিসাবেই তিনি নন্দিত হয়েছিলেন? না, তা নয় শুধু। সম্রাট জননী হিসেবেও তাঁর স্থান ছিল উচ্চে। আত্মজীবনীতে জাহাঙ্গীর একবারের কথা উল্লেখ করে সসম্মানে লিখেছেন—'...১২ই তারিখ শুক্রবার...লাহোরের কাছাকাছি পৌঁছলে আমি নৌকোয় উঠে ধর নামে এক গাঁয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমার

মহা-সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। চেঙ্গিজের রীতি, তৈমুরের বিধি এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে বয়ঃকনিষ্ঠরা বয়স্কদের যে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে সেইভাবে নতজানু হয়ে অভিবাদন ও সম্মান জানিয়ে এবং পৃথিবীর অধীশ্বর মহান আল্লার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার পর আমি ফেরার অনুমতি লাভ করি।'

আকবরের এই হিন্দু স্ত্রীর দেহাবশেষ সমাধিস্থ হয়ে আছে সেকান্দ্রায় আকবরের সমাধিস্থলের পাশে একটি অনবদ্য সমাধি মন্দিরে। মৃত্যুর পর তাঁকে রাজকীয় উপাধি দেওয়া হয়েছিল মরিয়ম (উজ্) জমানি—যার অর্থ 'the Mary of the Age'. মরিয়ম মাকানির যোগ্য পুত্রবধূর যোগ্য সম্মান!

জাহাঙ্গীরের অন্দরমহল

শেখ সেলিমের আশ্রয়ে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়েছিল বলে সম্রাট আকবর তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন সুলতান সেলিম। আর পিতা আকবরের মৃত্যুর (১৭ অক্টোবর ১৬০৫) এক সপ্তাহ পরে যুবরাজ সেলিমের রাজ্যাভিষেক হল হিজরি ১০১৪ সন, জামাদা-স্-সানি মাসের ২০ তারিখ, বৃহস্পতিবার—ইংরেজি ২৪ অক্টোবর ১৬০৫ তারিখে। আটত্রিশ বছরের এই নতুন সম্রাট নিজের নাম পরিবর্তন করতে চাইলেন রোমের সম্রাটদের অনুকরণে। তিনি ভাবলেন তাঁর নাম হওয়া উচিত জাহাঙ্গীর অর্থাৎ পৃথিবীর অধীশ্বর এবং সম্মানজনক পদবী হওয়া উচিত নুরউদ্দীন ; কারণ তাঁর সিংহাসনে প্রথম উপবেশনের সময় সূর্য তুঙ্গস্থানে অবস্থান করে পৃথিবীতে উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করে চলেছিল। তাছাড়া তিনি সাধুসন্তদের কাছে শুনেছিলেন যে সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর জনৈক নুরউদ্দীন ভারতের সম্রাট হবেন। সেজন্য অভিষেকের সময় তিনি 'নুরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ' নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

তা বলে একথা ভাবার কারণ নেই যে এই আটত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি কৌমার্যব্রত ধারণ করে এসেছিলেন। আনারকলির সঙ্গে তাঁর সুখ্যাত প্রেমের দীর্ঘ কাহিনী তাঁর যৌবনাবস্থাতেই ঘটেছিল। কিন্তু সে কাহিনী আমরা ইচ্ছে করেই বিস্তৃত করছি না, কারণ জাহাঙ্গীরের হারেমে তাঁর স্থান হল কই ? জাহাঙ্গীরের বিশাল হারেমে তাঁর প্রথম বিবাহিত পত্নী হয়ে যিনি এলেন, তিনি তাঁর মায়ের মতই মুসলমান কন্যা নন, রাজপুত হিন্দুরমণী। নাম তাঁর মানবাঈ। তিনি অম্বর-জয়পুরের অধিপতি রাজা ভগবানদাসের কন্যা। তাঁর আরও একটা পরিচয় তিনি এক হিসেবে (পালিত) কুনওয়ার মানসিংহের ভগ্নী। এই মহারাজা মানসিংহের পিসিমার সঙ্গেই তো সম্রাট আকবরের বিবাহ হয়। ভগবানদাস সে সময়ে ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তাও।

ভগবানদাস নিজে থেকেই তাঁর কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দেন—আবুল ফজল এমন কথাই বলেছেন। তারপর এল সেই শুভদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫৮৫। স্বয়ং সম্রাট পুত্র জাহাঙ্গীর ও অন্যান্য বরযাত্রীদের নিয়ে রাজপুত

রাজার রাজ্যে গেলেন শুভক্ষণ দেখে। দারুণ জাঁকজমক আর উৎসবের মধ্যে বিয়ে সমাপ্ত হল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই কন্যাদান প্রত্যক্ষ করলেন। প্রথমেই কাজীদের উপস্থিতিতে নিকার কাজ সারা হল। সম্রাট দু কোটি তঙ্কা পণ হিসেবে কন্যার পিতার হাতে তুলে দিলেন।

এর পরেই বিয়ে হল হিন্দুমতে—অগ্নি প্রদক্ষিণ করা হল, মালাবদল হল। এবার ভগবানদাসের সম্মান জানানোর পালা। তিনিও পণ হিসাবে বহুমূল্য উপহারাদি দিলেন। এর মধ্যে ছিল অনেকগুলো ঘোড়া, একশোটা হাতী, অনেক পুরুষ ও স্ত্রী পরিচারক-পরিচারিকা (এঁরা কেউ ছিলেন ভারতীয়, অন্যেরা আবিসিনীয় অথবা রুশীয়), রত্নাদিখচিত পাত্রসমূহ, প্রচুর হীরাজহরৎ—সেসবের হিসেব করা অসম্ভব। প্রত্যেক জায়গীরদার যাঁরা বরযাত্রী হিসেবে এসেছিলেন, পেলেন পার্শী, তুর্কী, আরবী ঘোড়া—তাতে সোনার রেকাব লাগানো—পদমর্যাদা অনুসারে। রাজার বাড়ি থেকে নিজের শিবির পর্যন্ত রত্নাদি আর টাকা ছড়াতে ছড়াতে বৌ নিয়ে ফিরে এলেন সম্রাট আকবর। দারুণ খাওয়াদাওয়া হল—চারিদিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। এমন করে বরযাত্রী নিয়ে গিয়ে সসম্মানে কন্যাকে নিয়ে আসা বুঝি মোগল সম্রাটদের ইতিহাসে নেই। আর মুসলমান এবং হিন্দু উভয় রীতিকেই সম্মান দিয়ে বিয়ে দানের ইতিহাসও বুঝি খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাণা এবং রাণী দুজনে মিলে কন্যা দান করেছিলেন—আকবরের হিন্দুধর্মের প্রতি ঔদার্যবশতঃই এসব কাজ সম্ভব হয়েছিল।

আর যে কন্যাটি বধূ হয়ে সেলিমের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন তাঁর রূপের কথা আর কি বলবো! তাঁর বুকের অনন্ত প্রেম এবং রূপের অসীম সমুদ্র নিয়ে তিনি অচিরে জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী হয়ে গেলেন। দুজনে মগ্ন হয়ে রইলেন এক গভীর স্বপ্নাবেশে প্রায় উনিশ বছরের ঘনিষ্ঠ জীবনে। সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর এই প্রথম বধূটিকে শাহ্ বেগম এই সম্মানজনক পদবী দিয়ে।

ঝিলামের কাছে এক শিবিরে জাহাঙ্গীর যখন এই বধূটিকে নিয়ে ছিলেন তখনই তাঁর প্রথম কন্যার জন্ম দিলেন মানবাঈ ২৫ এপ্রিল ১৫৮৬

তারিখে, বিয়ের এক বছর দু মাস পরে। এই কন্যার নাম ছিল সুলতান-উন-নিসা বেগম। ষাট বছর বয়সে কুমারী অবস্থাতেই পরে এই কন্যার মৃত্যু হয়। আর তিনি জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম পুত্রেরও। খুশরুর। সেদিনটি ছিল ৬ আগস্ট ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। হতভাগ্য খুশরুর মা তিনি। হতভাগিনী নিজেও। পুত্র জন্ম দিয়েছেন বলে শাহ বেগম উপাধির যে আনন্দ, তা তো ঐ পুত্র থেকেই উপভোগে বঞ্চিত হয়েছিলেন। খুশরু জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে বার বার দাবী করেছে পরবর্তী সিংহাসনাধিকারের অধিকার। খুশরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বিপুল বাহিনী নিয়ে জাহাঙ্গীর এগিয়ে গেলেন বিদ্রোহী পুত্রকে সমুচিত শিক্ষা দিতে। এতো চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে আফিং-এর নেশা পর্যন্ত করতে ভুলে গেছিলেন সেদিন। পঞ্জাবের কাছে জলন্ধরে যুদ্ধ হল। খুশরু পরাস্ত হলেন। তাঁকে হাতে পায়ে বেঁধে নিয়ে আসা হল জাহাঙ্গীরের কাছে। প্রবল তিরস্কার করে সম্রাট পিতা তাঁকে নিক্ষেপ করলেন বন্দীশালায়। তারপর এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

এমন এক অসম ও অবাঞ্ছিত যুদ্ধ থেকে সরে আসার জন্য মানবাঈ বার বার পুত্রকে অনুরোধ করেন। বলেন—বাবা বেঁচে থাকতে সিংহাসনের উপর লোভ করিস নে বাবা। এদিকে নিজের ভাই মাধো সিং বিদ্রোহী পুত্রের পক্ষাবলম্বন করেছেন। দারুণ তিরস্কার করেছিলেন বইকি জাহাঙ্গীর এজন্য প্রিয়তমা পত্নীকে। এমনিতেই ঘরে আবার এনেছেন আরও একটি রাজপুত কন্যাকে তাঁর সতীন করে। তার উপরে পুত্রের বিদ্রোহ, ভাইয়ের বিরুদ্ধতা এবং স্বামীর অপ্রেম উন্মাদিনী করে তুলল মানবাঈকে। কিছুতেই মনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না এই কোমল মনের অধিকারিণীটি।

সেদিন সেলিম গেছেন মৃগয়ায়। সতীন মানমতীর সঙ্গে মানবাঈ-এর চূড়ান্ত ঝগড়া হয়ে গেছে। স্বামীর আফিমের ডিব্বাটি নামিয়ে আনলেন সন্তর্পণে। তারপর একটা বিশাল আফিমের দলা ডেলা পাকিয়ে মুখে পুরে দিলেন। তাঁর উনিশ বছরের দাম্পত্য প্রেমের অবসান ঘটল এই আত্মহননে। খবর পেয়েই ছুটে চলে এলেন জাহাঙ্গীর মৃগয়া ছেড়ে।

তারপর গভীর শোকে লুটিয়ে পড়লেন মৃতা পত্নীর মরদেহের উপর। তখনও তো তিনি সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসেন নি।

জাহাঙ্গীর লিখেছেন তাঁর 'জাহাঙ্গীরনামা' আত্মচরিতে—"পুত্রের ব্যবহারে ও চালচলনে এবং তাঁর ভাই মাধো সিংহের কদর্য আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আমার স্ত্রী আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালেই আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর গুণাবলী ও মহত্ত্বের কথা কি লিখব? অদ্ভুত বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। আমার প্রতি তাঁর অনুরাগ এত গভীর ছিল যে আমার একটি কেশের জন্য তিনি হাজার পুত্র, হাজার ভাই ত্যাগ করতে পারতেন। খুশরুকে তিনি প্রায়ই লিখে পাঠাতেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে জানাতেন যেন সে আমার প্রতি অকপট হয় এবং আমাকে ভালোবাসে। যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর উপদেশে কোনও ফল হবে না এবং পুত্র যে কত দূর বিপথে যাবে তাও যখন অজ্ঞাত, তখনই তিনি রাজপুত চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ তেজের প্রাবল্যে ঘৃণায় প্রাণত্যাগ করাই মনস্থ করলেন। তাঁর মন অনেক সময়েই বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। এই ভাবটা তাঁদের বংশগত। তাঁর পূর্বপুরুষ ও ভাইদের মধ্যে কারও কারও উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা গেছে। আবার কিছুদিন পরই এ ভাবটা চলে যেত। হিজরী ১০১৩ সনের জিলহিজ্জা মাসের ২৬ তারিখ (৬ মে ১৬০৫) যখন আমি শিকারের জন্য বাইরে আছি তখন তিনি মনের উত্তেজনায় খানিকটা আফিং খান এবং খুব তাড়াতাড়ি মারা যান। তাঁর অপদার্থ পুত্রের এখনকার ব্যবহার যেন তিনি তখনই জানতে পেরেছিলেন।

"আমার যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর সঙ্গে আমারি প্রথম বিবাহ। খসরুর জন্ম হলে তাঁকে আমি শা বেগম উপাধি দিই। তাঁর ছেলে এবং ভাইয়ের আমার প্রতি অসদাচরণ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। এইভাবে তিনি এখানকার দুঃখ থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার প্রবল ভালবাসার জন্য এই মৃত্যুতে আমি এমন মুহ্যমান হয়ে পড়ি যে কয়েকদিন কোনও রকম আনন্দ উপভোগ করি নি, যেন আমার জীবনের অস্তিত্বই ছিল না। চারদিন অর্থাৎ বত্রিশ প্রহর কোনও খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করি নি।

আমার মহামান্য পিতা একথা জানতে পেরে আমাকে স্নেহপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন।"

যে সতীনের সঙ্গে মানবাঈ-এর কলহ হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা বলেছিলেন, তিনিও ছিলেন হিন্দু এবং রাজপুত রমণী। দুজনের নামের সঙ্গেও আশ্চর্য মিল। মানবাঈ আর মানমতী। মানমতী (বীলি ভুল করে বলেছেন বালমতী, মানরিকও তাই বলেছেন) ছিলেন মোটা রাজা উদয় সিংয়ের কন্যা। মানমতী আর বালমতী যে নামই তাঁর থাক, সে নাম পরে দেওয়া হয়েছিল মনে হয়। তাঁর আসল নাম ছিল বেটাছেলের মতো—জগৎ গোঁসাই। তাই বুঝি নাম বদল করা হয়েছিল। ঐ সতীনের সঙ্গে ভালবেসে ঘর করবে বলেই হয়তো। পরে অবশ্য যোধপুরের রাজকন্যা বলে যোধাবাঈ হিসেবেও তিনি সুপরিচিত হন।

দ্বিতীয় বধূ হিসেবে জাহাঙ্গীরের হারেমে মানমতী আসেন ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে—মানবাঈ-এর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। মানবাঈ নিশ্চয়ই পছন্দ করেন নি এই বিবাহ। একটা নিঃসপত্ন অধিকারে যখন বাধা পড়ল, তখনই তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। সতী নারী সব পারে, স্বামীকে সতীনের হাতে তুলে দিতে পারে না। কিন্তু মোগল অন্দরমহলে ঢুকে সতীত্বের গর্ব করবো, সতীনের জ্বালা সইবো না, তা তো হতে পারে না। তাই নিজের জ্বালা তিনি নিজেই মিটিয়ে গেছিলেন। মহিলাদের সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের দুর্বলতা ছিল খুবই। পিতার উপযুক্ত পুত্র সেদিক থেকে।

মানমতী বা যোধাবাঈ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম পুত্র খুররমের জননী হিসাবে। ইনিই পরে সাজাহান নামে খ্যাত এবং জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র না হয়েও মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাট। জাহাঙ্গীর তাঁর এই রূপসী বধূটি সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"মোটা রাজার কন্যা জগৎ গোঁসাইয়ের গর্ভে আমার পিতার রাজত্বের ছত্রিশ বছরে ৯৯৯ হিজরি সনে লাহোরে আমার পুত্র সুলতান খুররমের জন্ম হয়। তার জন্মে পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।... সে আমার অন্য সব ছেলেমেয়ের চেয়ে আমার পিতার দিকে বেশী দৃষ্টি

দিত। আমার পিতাও তার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আমাকে তার গুণের কথা শুনিয়ে বলতেন যে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্য কোনও ছেলেমেয়ের তুলনাই হয় না। সে-ই ছিল তাঁর প্রকৃত নাতি।"

লক্ষ্য করার বিষয় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মানমতীর বিয়ে হয় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আর শাহ্জাহানের জন্ম হয় ৫ জানুয়ারি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে বিয়ের ছ'বছর পরে। কে জানে মানবাঈ মানমতীকে স্বামী অঙ্কশায়িনী হতে দিতে দেরী করেছিলেন কিনা!

আকবর প্রথম বার কাশ্মীরে যান ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে। সেখানকার রাজারা ভয় পেয়ে আকবরকে প্রভূত উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন। ছোট তিব্বতের অধিপতি আলি রাই নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে আকবরের কাছে এসে যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। আকবর সানন্দে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সেই মতো মেয়েটিকে নিয়ে আসা হল লাহোরে এবং ১লা জানুয়ারি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সেলিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। জাহাঙ্গীর হারেম আরও একটু বৃদ্ধি পেল।

এর ঠিক পরের বছরটিতেই তাঁর হারেমে এলেন আর এক সুন্দরী, দাক্ষিণাত্যের কন্যা। তাঁর বাবা ছিলেন খান্দেশের অধিপতি রাজা আলিখান। আলি রাই-এর পর আলিখানের কন্যা এলেন হারেমে। সেও ঐ বশ্যতা স্বীকারের উপহার হিসেবে। এসব বিয়েতে সম্মান থাকে না, বধূর সসম্মান স্বীকৃতিও থাকে না। এসব কন্যা শুধু উপভোগের সামগ্রী হয়, মনের কোণেও এঁরা স্থান পান না।

কিন্তু প্রবল ভালবাসার দাবীতে এসেছিলেন জৈন খান কোকার কন্যা জাহাঙ্গীরের হারেমে। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। সেলিম মাঝে মাঝে পিতৃদ্রোহিতার লক্ষণ দেখাচ্ছেন। এরই মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে গভীরভাবে প্রেমে পড়ে গেছেন জাহাঙ্গীর। পিতার কাছে বলে পাঠালেন এই মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করতে চান। আকবর পুত্রের ঔদ্ধত্য দেখে দারুণ রেগে গেলেন। বললেন—না, হবে না এ বিয়ে। সেলিমও

ক্ষুণ্ণ হলেন। পিতাকে একটুও কেয়ার না করে সুন্দরীর সঙ্গে মত্ত হলেন নর্ম বিলাসে। আকবর দেখলেন এই দুর্বিনীতটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে শেষে বিবাহে সম্মতি দিলেন। খুবই অসম্মান বোধ করলেন অবশ্য তিনি।

জাহাঙ্গীরের অন্দরমহলে অতএব এলেন আরও এক সুন্দরী। মানবাঈ বোধকরি আরও হতাশ হলেন। কারণ জাহাঙ্গীর যে তাঁকে ভালবেসে ঘরে আনলেন। শুধু তাই নয় সেই সূত্রে এলেন আরও এক অপরূপ সুন্দরী সাহিব জমাল। সাহিব জমাল হলেন ঐ জৈন খান কোকার জ্ঞাতি ভগ্নী। আর সাহিব জমাল শব্দের অর্থ সৌন্দর্যের রাণী। এঁরই গর্ভে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ।

এর মধ্যে হারেমে হাজির হয়েছে শতেক খানেক উপপত্নী রক্ষিতার দল। তাঁদের কেউ কেউ জাহাঙ্গীরের সন্তানদেরও গর্ভে ধারণ করেছেন। এঁদের কারও কারও কথা আবার সগর্বে জাহাঙ্গীর ঘোষণাও করেছেন। আসলে যার যত উপপত্নী, তারই তো তত গর্ব আর সম্মান। জাহাঙ্গীর লিখেছেন 'খুরমের জন্মের পর আমার উপপত্নীদের গর্ভে আরও কয়েকটি সন্তান হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম দিই জাহান্দার ও আর এক-জনের নাম শাহরিয়ার।' শেষ জনকে সিংহাসন পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়েই জাহাঙ্গীরের শেষ জীবনের নাটক বেশ জমে উঠেছিল।

এঁরা ছাড়াও জাহাঙ্গীরের হারেমে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন আরও বহু রাজপুত হিন্দু এবং মুসলমান নারীর দল। এঁদের মধ্যে দু-একজনের কথা বলি। তারপর বলব তাঁর আদরের নূরজাহানের কথা।

বিকানীরের রায়বার সিং খুবই অনুগত হয়ে পড়েছিলেন জাহাঙ্গীরের। আমির-উল্-উমারার সুপারিশে তিনি জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হওয়ার পর জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর আনুগত্য এত বৃদ্ধি পায় যে আগ্রা ছেড়ে বিদ্রোহী পুত্র খুশরুকে তিনি যখন শাস্তি দিতে চলে যান, তখন অগাধ বিশ্বাসে রায়বার সিংকে আগ্রা এবং সমগ্র হারেমের ভার দিয়ে যান। এক সময়ে তিনি রায়বার সিংয়ের একটি কন্যাকেও বিবাহ করে হারেমে স্থান দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য তিনি সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসেছেন।

তাঁর রাজ্যাভিষেকের তৃতীয় বৎসরে তিনি বিয়ে করেন রাজা মানসিংয়ের পৌত্রীকে (পুত্র জগৎসিংয়ের কন্যা)। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীর নিজেই লিখে গেছেন—'রাজা মানসিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংয়ের কন্যাকে বিবাহ করবো দাবী করে ১৬ই মহরম বিবাহের উপহার স্বরূপ আশি হাজার টাকা রাজার গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁর বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম। ৪ঠা রবিয়ল আওয়াল জগৎসিংয়ের কন্যা আমার হারেমে আসেন। মরিয়ম জমানি বেগমের আবাসে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়। তাঁর সঙ্গে যে সব যৌতুক রাজা মানসিংহ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে বাটটি হাতিও ছিল।'

আর অনুরোধে পড়ে বিয়ে করেছিলেন রামচাঁদ বান্দিলার কন্যাকে। এই বিবাহ হয় তাঁর রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বৎসরে।

এবার নূরজাহানের কথা। আগেই বলে নেওয়া ভাল, ঐতিহাসিক-দের মধ্যে এই আখ্যান নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। নূরজাহানের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের প্রাক্‌বিবাহ প্রেম এবং শের আফগানের হত্যা—দুটি বিষয়েই ঐতিহাসিকরা এখনও স্থির নিশ্চিত হতে পারেন নি। কিন্তু বেশির ভাগ ঐতিহাসিক যা মেনে নিয়েছেন তার কথা বলতে আমাদের অসুবিধা কোথায়?

মির্জা ঘিয়াস বেগ ছিলেন তেহেরানের অধিবাসী খওয়াজা মুহম্মদ শরীফের পুত্র। খুরাসানের শাসনকর্তা মুহম্মদখান টাকলুর অধীনে উজির ছিলেন শরীফসাহেব। তিনি মারা গেলে পরবর্তী রাজা শাহ্ তাহ্মাস্প-এর অধীনেও তিনি উজির থাকেন। এবং থাকতেন ইয়াজ্‌দ্-এ। শরীফসাহেবের দুই পুত্র, আকা তাহির আর এই ঘিয়াস বেগ। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বাবা গেলেন মারা। দুটি পুত্র আর একটি কন্যা নিয়ে ঘিয়াস বেগ দারুণ অসুবিধেয়। সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র, কিন্তু এখন ভাগ্য হয়েছে বিপরীত। অতএব চলো সোনার দেশ ভারতে—যদি ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। তাই চলে এলেন হাঁটতে হাঁটতে পূর্ণগর্ভবতী স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। পথে পথে দস্যুভয়। একদিন দস্যুরা নিলে তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। কেঁদে গিয়ে পড়লেন যূথসাথী দলপতি মাসুদ মালিকের

কাছে। তাঁর অবস্থা দেখে দয়া হল মালিক মাসুদের। কারণ এর মধ্যে কান্দাহারের পথে যেতে যেতে ঘিয়াসের গর্ভবতী স্ত্রী জন্ম দিয়েছেন একটি শিশু-কন্যার (১৫৭৭)। এই কন্যার নাম দেওয়া হল মিহরউন্নিসা। চোখে দেখতে পারেন না এই পরিবারের কষ্ট মালিক মাসুদ।

শেষে সকলে গিয়ে পৌছলেন ফতেপুরে, সম্রাট আকবরের দেশে। প্রতিবারই বিত্তশালী মালিক মাসুদ আকবরের কাছে নানা উপহার নিয়ে হাজির হন। এবারের উপঢৌকন তেমন ভাল লাগল না আকবরের। মালিক মাসুদ মানুষ চিনতেন। তিনি বুঝেছিলেন এই ঘিয়াস বেগ সামান্য যাত্রী নয়, এর মধ্যে নানা গুণ আছে। তাই আকবরকে বললেন —জাঁহাপনা, আমার উপঢৌকন যদি ভাল না লেগে থাকে তবে কসুর মাফ করবেন। এবারে একটি 'সজীব চীজ' এনেছি দেখবেন নাকি! এই বলে মির্জা ঘিয়াস বেগকে নিয়ে আকবরের কাছে হাজির হলেন। আকবর ঘিয়াস আর তাঁর পুত্র আবদুল হাসানকে (পরে আগা খাঁ নামেই বিখ্যাত) দেখে বাজিয়ে বুঝলেন—তাঁরা 'আস্‌লী চীজ'। অমনি ঘিয়াসকে একটা ভাল মাইনের চাকরি দিয়ে দিলেন আকবর। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ধীরে ধীরে মির্জা সাহেব দেওয়ান পদে নিজেকে উন্নীত করলেন। ভারী মার্জিত এবং রুচিশীল মানুষ ছিলেন তিনি। লেখা-পড়ার কাজ ভাল জানতেন, ছিল কবিতা পাঠের রসগ্রাহিতা।

ধীরে ধীরে রাজত্বে এলেন জাহাঙ্গীর। তাঁর আমলে তিনি উন্নীত হলেন তিনশতী মনসবদার থেকে দেড়হাজারী মনসবদারে আর খেতাব পেলেন 'ইৎমদ-উদ্-দৌলা'।

বাদশাহী হারেমে অনায়াস প্রবেশাধিকার ছিল মাসুদ-পত্নীর। হারেমে যাবার সময় মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যেতেন কন্যাসম মিহরকে আর তার মা আসমৎ বেগমকে। এর মধ্যে মিহর বড় হয়ে উঠেছেন। যে বছর সম্রাট হলেন জাহাঙ্গীর, তখন তো সে পূর্ণ যুবতী। কবে যে শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেছে—তিনিও নিজে বুঝি জানেন না। অসামান্য সৌন্দর্য ফুটে উঠেছেন মিহর-উন-নিসা—অনেকটা নিশার স্বপনের মতই। যুবরাজ থাকতেই সেলিম তাঁকে

দেখতেন। দেখতেন আর সেই মনোলোভা সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে যেতেন। সেলিমও তো কম সুন্দর নয়, সম্রাটপুত্র বলে কথা! দুজনের মধ্যেই কখন মদনদেবের আরতি শুরু হয়ে গেছিল কে জানে।

কথাটা ক্রমে ক্রমে কানে উঠল আকবরের। এর মধ্যে আকবর যখন লাহোরে ছিলেন সে সময়ে ইরাক থেকে দ্বিতীয় শাহ্ ইসমাইলের সঙ্গে এসেছিলেন আলি কুলি বেগ ইস্তাজলু। তিনি ছিলেন একজন অ্যাড্‌ভেঞ্চারার। পারস্যাধিপতির তিনি ছিলেন একজন সফরচি (ইংরেজিতে যাকে বলে টেব্‌ল্‌সারভেন্ট)। তিনি এখন আকবরের রাজকীয় ভৃত্যশ্রেণীর মধ্যে একজন হলেন। ক্রমে তাঁর ভাগ্যোদয় হল। যুবরাজ সেলিমের সহকারী হয়ে তিনি গেলেন মেবারের রানাকে জব্দ করতে। একদা একটি সিংহ (বাঘ বোধহয় নয়) মেরে জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এই সাহসী সুদর্শন যুবক 'শের আফগান' (এই নামেই খ্যাত) উপাধি পান। আকবরও এই ছেলেটিকে ভালবাসতেন। তাই যখন শুনলেন যুবরাজ সেলিম গভীরভাবে প্রেমে পড়েছেন মিহর-উন-নিসার সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল আলি কুলি ইস্তাজলুর কথা। আর ডেকে পাঠালেন মির্জা ঘিয়াসকে। দুজনের শলাপরামর্শ হল। তারপর যুবরাজের কথা একটুও না ভেবে মিহর-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন শের আফগানের। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে বিয়ে হয়ে গেল মিহরের। ২৪।২৫ বছরের যুবক জাহাঙ্গীর আশাহত হয়ে ফুঁসতে লাগলেন। আর আকবর শের আফগানকে জায়গীর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন দূর বর্ধমানে। দুজন দুজন থেকে অনেক দূরে গেলেন।

কিন্তু দূরে গিয়েই বোধ হয় প্রেমে বেগ আনল। জাহাঙ্গীরের হৃদয় আপাত শান্ত হলেও, অন্তরে জোয়ার বইতেই লাগল। শেষে সুযোগ এল। আকবর পাদশাহ মারা গেলেন। পরিত্যক্ত সিংহাসনে এসে বসলেন জাহাঙ্গীর পাদশাহ।

ডেকে পাঠালেন বিশ্বস্ত কুতব-উদ্দীনকে। বললেন—তাড়াতাড়ি চলে যাও বর্ধমানে। গিয়ে দেখা কর শের আফগানের সঙ্গে। আর সঙ্গোপনে দেখা করো মিহর-এর সঙ্গে। চুপে চুপে তাকে বলো আমার মনের

গোপন ইচ্ছার কথা, তাকে চিরদিনের জন্য পাবার ইচ্ছার কথা। কুতব-উদ্দীন হলেন তাঁর দুধভাই। কুতব রওনা হয়ে গেলেন। প্রথম সুযোগেই শের আফগানকে দেখা করতে বলে পাঠালেন। কিন্তু শের তো মানুষ—তিনিও জানেন দিওয়ানা জাহাঙ্গীরের মহব্বতের কথা। মিহর তো সব ভুলে গেছে—সে তো কায়মনোবাক্যে স্বামীর প্রেমলগ্না আছে। কেন তবে সুখের সংসারে আবার আগুন জ্বালাতে কুতবকে পাঠিয়েছেন জাহাঙ্গীর। দেখা করবেন না ঠিক করেছেন তাই।

এদিকে অস্থির হয়ে পড়েছেন কুতবউদ্দীন। তাই তার আগমনের প্রত্যাশা না করেই একদিন চলে গেলেন শের আফগানের জায়গীরে। কুতব তো নিজে বাংলার শাসনকর্তা এখন, ভয়ই বা কিসের। আর তারই অধীনস্থ জায়গীরদার হয়ে লোকটার এতো আস্পর্ধা যে ডেকে পাঠালে আসে না। দুর্বিনীত অবাধ্য লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যেই তিনি সসৈন্যে চলে এলেন বর্ধমানে (মার্চ ১৬০৭)।

শের আফগান যেন একটা দুরভিসন্ধির গন্ধ পেলেন সর্বত্র। কুতব এসে শের আফগানকে বেশ ধমক দিলেন। বোধকরি মিহর-উন্-নিসাকে পাঠিয়ে দিতে বললেন জাহাঙ্গীরের হারেমেও। রক্ত ছলকে উঠল তুর্কী বীরের কলিজায়। কেউ কোনো কথা বলবার আগেই আস্তিনের নিচে লুকানো ছোরা বের করে শের আফগান আমূল বসিয়ে দিলেন কুতব-উদ্দীনের বুকে। ঢলে পড়লেন কুতব। পীর অম্বাখান কাশ্মীরী বলে এক বীর সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়লেন শের আফগানের উপর আর তরবারি দিয়ে সোজা আঘাত হানলেন তাঁর মাথায়। তুর্কীবীর এত সহজে হার মানে না। এক ঘুষিতে সরিয়ে দিলেন পীর খানকে। কিন্তু কুতব-এর আরও অনুচরেরা এগিয়ে এলো এবং শের আফগানের অনিবার্য পতন ঘটালো। বর্ধমানের বুকে শের আফগানের কবর সেই নির্মম হত্যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

মিহরকে অন্দরমহলে আনার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ করেছিলেন স্বয়ং পিতা। এবার? এবার দ্বিতীয় বাধা অপসারিত হল। শের আফগান নহত। অতএব তাঁর বিধবা পত্নী আর কন্যাকে নিয়ে আসা হল আগ্রায়.

এবং বৃদ্ধা রাণীমাতার তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হল।

এমনি করে দিন যেতে লাগল। জাহাঙ্গীর হয়তো এরই মধ্যে কোন-দিন পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পূর্ব প্রণয়িনীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব। স্বামী-হন্তাকে বিবাহের ব্যাপারে কোনো নারী কি সহজেই এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে? কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনীতিতে নতুন সমাচার দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। মিহরউন্নিসার ভাই আসফ খাঁয়ের কন্যা আর্জমন্দবানু বেগমের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান—ভবিষ্যৎ ভারতের সম্রাটের বিয়ের কথা হয়েছে। এখন মিহর রাজী না হলে তো চলে না। সত্যিই জাহাঙ্গীর বাগদত্তা বধূটিকে ঘরে না এনে অন্য একটি নারীর সঙ্গে খুর্‌রমের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাহলে তো তাঁর ভাইঝির পাটরাণী হওয়া যায় না। অতএব রাজী হতে হল মিহরকে

কথায় বলে সময় হচ্ছে সবচেয়ে বড় বৈদ্য। ধীরে ধীরে স্বামীর মৃত্যুর শোক মিহরের হৃদয়ে মন্দীভূত হতে আরম্ভ করেছিল। আর, একটা ক্ষমতার লোভ ক্রমশ তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করছিল। ভারতের সম্রাজ্ঞী হবার প্রবল লোভ তাঁকে তাড়না করছিল। সামনে অজস্র সুখ হাতছানি দিতে লাগল। সময় যত কাটে, তত ভিতরের আকাঙ্ক্ষাটা নড়াচড়া করে ওঠে।

অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকের ষষ্ঠ বর্ষে মিহর-উন-নিসার মত পরিবর্তন ঘটল। সেই উৎসবের একটি দিনে উভয়ের চোখে তৃষ্ণার বারি উপচে উঠল। সম্মতি পাওয়া গেল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের মে মাস। মিহর পঁয়ত্রিশ। জাহাঙ্গীর বিয়াল্লিশ। হলেই বা পঁয়ত্রিশ। মিহরের শরীরে তখন ষোড়শীর অজস্র রূপধার। মিহর, বাইরের মিহর প্রবেশ করলেন জাহাঙ্গীরের অন্দরমহলে। মানবাঈ আগেই চলে গেছেন। সেই পাটরাণীর শূন্য স্থানে অভিষিক্ত হলেন মিহর।

কিন্তু মিহর—সে নামে তো শের আফগানের অবাঞ্ছিত স্মৃতি। জাহাঙ্গীর নিজে তো নূর। তার আলো এই রূপসী সুন্দরী। অতএব. নতুন নামকরণ হল এই রূপ উজল করা মহিষীর। নাম হল নূরমহল—মহলের প্রদীপ। তাই বা কেন? এতো ছোট নামে এই সুন্দরীকে তো

ধরা যায় না। তিনি তো শুধু মহলের আলো নন, জগতের আলো। একদিন তাই নূরমহল হয়ে গেলেন নূরজাহান। জাহাঙ্গীর এই প্রেয়সীর কাছে জীবনযৌবন ধনমান ইহসংসারের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা সমর্পণ করে শুধু একটু 'সীর' আর আফিমের নেশা আর একটু মাংসাহারেই তৃপ্ত হয়ে রইলেন। চল্লিশ বছরের অনুপম সুন্দরী নূরজাহান নাম পেয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

মোগল হারেমের নির্বাচিত কক্ষে এবার শুরু হল জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের যৌথ জীবন। শয়নে স্বপনে নিশিজাগরণে উভয়ের প্রেম ক্রমাগত ঘনীভূত হতে থাকল। শুধু রূপজ মোহ নয়, নূরজাহানের অজস্র গুণেই বশীভূত হয়ে গেলেন জাহাঙ্গীর। শ্বশুর ঘিয়াস বেগ 'ইৎমদ-উদ্দৌলা' উপাধি থেকে উন্নীত হলেন 'বকিল-ই-কুন'—সব কাজে সম্রাটের প্রতিনিধিত্বের দুর্লভ সম্মানে। নূরজাহানের নামেই নিনাদিত হতে থাকল ভেরীবাদন। ফারমান জারির অধিকারও পেলেন নূরজাহান। সম্রাট নামে মাত্র কার্যপরিচালনা করতে লাগলেন।

সুরাপায়ী সম্রাট। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। নূরজাহান চিন্তিত। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের কথাও ভাবছেন তিনি। শাহজাহান ক্রমাগত প্রবল হয়ে উঠছেন। ভাল লাগে না তাঁর এই দুর্বিনীত সপত্নী পুত্রটিকে। তাই তাঁর ক্ষমতালোপের চক্রান্তে নামলেন। জাহাঙ্গীরের দাসীপুত্র শাহরিয়রের সঙ্গে নিজের মেয়ে লড়িলীর বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই প্রবল ইচ্ছা এই 'অপদার্থ'টাকে কিভাবে সিংহাসনে বসান। জামাই বলে কথা! একদিকে সতীনের ছেলে, প্রায় নিজের ছেলের মতোই। তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন নিজের আত্মজা, শের আফগানের ঔরসজাত লড়িলীর। চমৎকার! কাজেই ঐ 'না-সুদনি'কে (লোকে এই নামেই ডাকতো—ইংরেজিতে এর অর্থ গুড ফর্ নাথিং) যদি সিংহাসনে বসানো যায় তাহলে তাঁরই সুবিধে। জাহাঙ্গীরের মতো জামাইটিও তো তাহলে তাঁর করতলগত থাকে। জাহাঙ্গীরের কানে তাই বিষ ঢালতে লাগলেন তিনি। ফলে সাজাহানের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর নানা ব্যবস্থা নিতে লাগলেন। 'বেদৌলত' ভাগ্যহীন সাজাহানকে তিনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে

লাগলেন আর পরিবর্তে শাহরিয়রকে নানা সম্মানে সম্মানিত করতে লাগলেন। তাঁকে দিলেন ঢোলপুর। দিলেন বারো হাজারী জাত আর আট হাজারী সওয়ারের অধিকার আর কান্দাহার অভিযানের দায়িত্ব। হায় জাহাঙ্গীর, তোমার প্রিয়তম পুত্রের বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত তুমি বুঝতে পারলে না রূপের নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে? সাজাহান চিঠি লিখলেন বাবাকে সব কথা জানানোর জন্যে। নূরজাহান অনুমতি দিতে দিলেন না।

কিন্তু নূরজাহানের ভাগ্যে তখন কলির অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। ভাই আসফ খাঁ নিয়েছেন সাজাহানের পক্ষ। তবুও সাজাহানকে বশ্যতা স্বীকার করতে হল। নূরজাহানের কাছে ক্ষমা চাইতে হল। খুব খুশী নূরজাহান। অন্দরমহলের পর্দাকে তিনি মানেন না। সেই অন্দরমহলের আয়ত্তেই আসতে হল সাজাহানকে।

কিন্তু তা এতো সহজে হল কই! ভাই আসফ খাঁর সঙ্গে সেনাপতি মহব্বৎ খাঁর ছিল মনোমালিন্য। তাই নিয়ে মহব্বৎ বন্দী করলেন একদিন জাহাঙ্গীরকে। ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়ে নূরজাহান সম্রাটকে বন্দীমুক্ত করতে চাইলেন। পারলেন না। তাই অশেষ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্বেচ্ছা-বন্দিনী হয়ে সম্রাটস্বামীর সঙ্গে থাকতে লাগলেন।

এদিকে স্বামীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে চলেছেন নূরজাহান। সেই পরামর্শ মতো জাহাঙ্গীর প্রতিদিন নূরজাহানের নামে নানা কুৎসা রটনা করে তার মন জয় করতে লাগলেন। দারুণ বিশ্বাসে মহব্বৎ প্রহরী পর্যন্ত রাখলেন না। সেই সুযোগে দুজনে খোজা হুঁসিয়ার খাঁর সাহায্যে মহব্বৎকে পরাভূত করে মুক্তিলাভ করল।

মুক্তি পেলেন বটে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে গেল জাহাঙ্গীরের। খসরুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। পরভেজও নেই। ভগ্ন হৃদয়ে ২৮ অক্টোবর ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ৫৮ বছর বয়সে জাহাঙ্গীর চলে গেলেন।

নূরজাহান আগেই হারেমের পর্দা উন্মোচন করেছিলেন। এই প্রথম মোগল সম্রাটের অন্দরমহলে বহির্মহলে ফারাক রইল না। ফারাক রাখতে দেননি জাহাঙ্গীর নিজেই। স্ত্রীর নামেই ফারমান জারির অধিকার দিয়েছিলেন। সোনার টাকায় মুদ্রিত থাকত নূরজাহানের নাম। সমস্ত

রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও ঐ স্ত্রীরই ছিল। জাহাঙ্গীর নেই। কিন্তু তা বলে ক্ষমতার মোহ যাবে কোথায়? শাজাহানকে সিংহাসনে বসানো দূর-অস্ত্। ভাই আসফ খাঁ বিরোধিতা করে পরলোকগত খুসরুর ছেলে বুলাকীকে (দওয়ার বখ্শ্) সিংহাসনে বসানোর জন্যে চক্রান্ত করতে শুরু করেছেন। কিন্তু শেষ অবধি সিংহাসনে এসে বসেছেন সেই শাজাহানই।

আর কেন সুখের জন্য লালসা। স্বামীর মৃত্যুর পর আশ্চর্য সংযমে বিধবার ন্যায় শ্বেতবস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করে রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। জাহাঙ্গীরকে তিনি কোন সন্তান পর্যন্ত উপহার দিতে পারেন নি।

আরও আশ্চর্য তাঁর জীবনকে মানিয়ে নিয়ে চলার শক্তি। একদা শাজাহানের জয়লাভে যিনি বিশাল ভোজসভা আহ্বান করেছিলেন, যে সাজাহান তাঁকে সম্মান করে প্রভূত দানে সম্মানিত করেছিলেন তাঁর কাছেই পরম নিশ্চিন্ততায় আশ্রয় নিলেন। সাজাহানও তাঁকে বার্ষিক দুলক্ষ টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রামসর গ্রাম, টোডা পরগনা—নূরজাহানের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি আর রইল না। শুধু রইল অজস্র স্মৃতি। তাঁকে আর অন্যান্য বেগমদের নিয়ে প্রকৃতি-প্রেমিক জাহাঙ্গীরের নানা স্থানে ভ্রমণের স্মৃতি। তাঁর প্রাসাদে আহূত হাজারো ভোজসভার স্মৃতি। মনে পড়ে যায় নিজের হাতে বাঘ মেরেছিলেন বলে স্বামী খুশি হয়ে তাঁকে লক্ষ টাকা দামের একজোড়া হীরের ব্রেসলেট দেন। এমনি আরও শতেক স্মৃতি ভার হয়ে তাঁকে বেদনা দেয়। পেটের মেয়েটা পর্যন্ত চলে গেছে। তাই বিধবা আর দুঃখীদের দান দাক্ষিণ্য করে তাঁর সময় কাটে। এক সময়ে কতো দুঃখী—অন্ততঃ ৫০০ জনের—মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আর নিজেই এখন কতো দুঃখী। ৭০ বছরের দুঃখী উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই মহিলার জীবনাবসান ঘটে ৮ ডিসেম্বর ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে। স্বামীর সমাধি মন্দিরের পাশে বাহুল্য-বর্জিত এক সমাধি মন্দিরে তিনি সমাহিতা রইলেন। সেখানে খোদিত রইল—

বর্ মজারে মা গরীবা না চিরাগে না গুলে
না পরে পওয়ানা আয়েদ্ না সজারে বুলবুলে।

'দীনের গোরে দীপ দিও না
সাজায়ো না ফলফুলে
পোকায় যেন পোড়ায় না পাখ্
গায় না গাথা বুলবুলে।'

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ)

নূরজাহান চলে গেছেন অন্দরমহল ছেড়ে। কিন্তু ভারতীয় নারীর অন্দরমহলে রয়ে গেছে তাঁর পোশাক-আশাক সাজসজ্জার বিশিষ্ট রীতি। কবিতাপ্রিয় এই বীর রমণীর গাথা আজও কীর্তিত হয়ে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।

সাজাহানের অন্দরমহল

নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী এবারে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নিজের বিদ্রোহী পুত্র খুসরুকে অন্ধ করে দিয়েছেন—আপাতত আর সিংহাসন নিয়ে তাই ভাবনা রইল না জাহাঙ্গীরের। এবার দরকার পারসীকদের দমন। পুত্রের বিদ্রোহকে কড়া হাতে মোকাবিলা করে জাহাঙ্গীর তাই গেলেন লাহোরে। তারিখটা ছিল ৯ মে ১৬০৬। লাহোরে থাকতে থাকতেই ভাবলেন একবার কাবুলে যাওয়ার দরকার। যাবার আগে খবর পাঠালেন তৃতীয় পুত্র আদরের খুররমকে—পুত্র, যথাশীঘ্র তোমার মা আর বেগম মরিয়ম-উজ-যমানি ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে নিয়ে লাহোরে চলে এসো। রাজকুমার খুররম সেইমতো এলেন লাহোরে।

খুররমের আচার-আচরণে ক্রমশই জাহাঙ্গীর প্রীতিলাভ করে চলেছেন। ১৬০৭-এর মার্চ মাসে তিনি প্রিয়পুত্রকে আট হাজার জাত আর পাঁচ হাজার সোওয়ারির মনসবদারি দিয়ে সম্মানিত করলেন। এখন পুত্রটি বেশ ডাগর হয়ে উঠেছেন। বয়সেও নয় নয় করে পনেরো বছরের কৈশোরে প্রস্ফুটিত। ঐ মার্চেরই শেষ সপ্তাহে জাহাঙ্গীর পুত্রের বিয়ের কথা তুললেন। ইতিমধ্যে তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন ইতিকাদ খাঁর কন্যা আর্জুমন্দ বানু বেগম-এর সৌন্দর্যের কথা।

কে এই ইতিকাদ খাঁ? তিনি তেহেরানের খাজা মুহম্মদ শরীফ-এর পুত্র মিরজা গিয়াস বেগের একমাত্র পুত্র সন্তান। অবস্থার বিপাকে পড়েছিলেন মিরজা গিয়াস বেগ। ভাগ্যান্বেষণে বের হয়ে এলেন হিন্দুস্তানে তাঁর গর্ভবতী পত্নীসহ। কান্দাহারে পৌঁছেই তাঁর পত্নী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যাই মিহরুন্নিসা—যার বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানের জায়গীরদার আলিকুলি ইস্তাগলু নামে এক পারসিক ভ্রমণকারীর সঙ্গে। আলিকুলি নামটা অপরিচিত লাগছে? তাহলে বলি ইনিই সেই ইতিহাস-খ্যাত শের আফগান—যাঁর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর তাঁর বিধবা

পত্নীকে বিয়ে করে নূরমহল ও নূরজাহান উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বিতীয় বিয়ের সময় নূরজাহানের বয়স পঁয়ত্রিশ।

এই মিহরুন্নিসার একটি ভাই ছিলেন। তিনিই এই ইতিকাদ খাঁ—ইতিহাসে পরে যিনি খ্যাত হন 'আসফ খাঁ' এই উপাধি—নামে। ইতিকাদ খাঁ-র মেয়েটি ইতিমধ্যে চতুর্দশীর চাঁদের লাবণ্যে ভরপুর। জাহাঙ্গীরের প্রস্তাবে স্বভাবতই খুশী হলেন ইতিকাদ। কন্যা-চাক্ষুষের দিন জাহাঙ্গীর স্নেহভরে নিজের হাতে আর্জুমন্দ বানু বেগমের হাতে আংটি পরিয়ে দিলেন। তিনি যে তাঁর প্রিয়তম পুত্র খুররমের ভাবী বধূ। ভাবী পুত্রবধূর মঙ্গল কামনায় বিশাল উৎসবেরও আয়োজন করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। পুত্রের সম্মান বৃদ্ধির জন্য কাবুল থেকে ফেরার পথে ঐ বছরের নভেম্বর মাসেই জাহাঙ্গীর শাজাহানকে উজ্জয়িনীর একটি জায়গীর হিসার ফিরোজার সরকার এবং লাল তাঁবু খাটাবার অধিকার দিলেন। আরও দিলেন রাজকীয় শীলমোহর ব্যবহারের ঢালাও অধিকার। এসব খবর কি আর্জুমন্দ বানুর কানে পৌঁছল ? স্বামীগর্বে তিনি কি গর্ব অনুভব করতে লাগলেন ? খুররমও কি তাঁর এই চতুর্দশী ভাবী পত্নীর কল্পনায় নিমগ্ন হলেন ?

ইতিহাস মাঝে মাঝে কথা বলে না। শুধু বলে জাহাঙ্গীর ছেলে বড়ো হয়েছে দেখে তাঁকে উরতাবাগের প্রাসাদটি দান করে দেন। খুররম সেটিকে মনোমত করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন। দেখে ভারী খুশী হয়েছেন পিতা। পিতার বদান্যে তাঁর ভাগ্যে আরও সম্মান স্তূপীকৃত হয়েছে। ১৬০৮-এ জাহাঙ্গীর পুনশ্চ ফিরে এসেছেন আগ্রার রাজপ্রাসাদে। পুত্র এখন ষোল বছরে পা দিয়েছে। ভাবী বধূর জন্য সংসার পাতার প্রয়োজন। তাই পৃথক মহলের ব্যবস্থা—মহম্মদ মুকীম-এর মহলটি তাই তাঁকে দিয়েছেন। আর দিয়েছেন চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি আশ্চর্য পান্না ও দুটি মুক্তো। খুররম হয়তো মনে মনে এসব নিয়ে আর্জুমন্দের ভূষণ নির্মাণ করছেন। এমন সময় এল এক নতুন সংবাদ। সে সংবাদে চাঘতাই বংশের বহির্মহল আর অন্দর মহল কেঁপে ওঠেনি নিশ্চয়ই। মুঘলদের একাধিক পত্নী কোনো বিশিষ্ট সংবাদ নয়। তবুও এই

নতুন খবরে খুররমের মনে কি কোনো প্রতিক্রিয়া জাগেনি ?

১৬১০-এর গোড়ায় আবার নতুন করে সম্বন্ধের কথা উঠল। বাগদত্তা আর্জুমন্দ দূরে পড়ে রইলেন। পারস্যের শাহ্ ইসমাইল-এর বংশধর মির্জা মুজফ্‌ফর হুসেন সফাবির মেয়ের সঙ্গে নতুন করে বাগদানের কথা তুললেন জাহাঙ্গীর। কিন্তু কেন ? আর্জুমন্দের সঙ্গে তবে কি কোনো মনান্তর ঘটেছে খুররমের ? হোক না তার একাধিকবার বিয়ে, কিন্তু আর্জুমন্দকে দূরে সরিয়ে রেখে কেন এই নতুন বিয়ের প্রস্তাব ? তবে কি খুররম নতুন করে এই মেয়েটির প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছেন ?

ইতিহাস সব কথা বলে না। কিন্তু ঘটনা কথা কয়ে চলে। ১৬০৭-এর তিরিশের মার্চে বাংলার শাসনকর্তা কুতবউদ্দীনের হাতে জাহাঙ্গীরের আদেশে শের আফগান নিহত হয়েছেন। শের আফগান যে তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন। একদা তো এই মিহরুন্নিসাকে সলীমই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। পিতা আকবর সে ইচ্ছা পূরণ না করে আলিকুলির হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর বাঞ্ছিত ধন। ১৬০৫-এ আকবরের মৃত্যু হয়েছে। অতএব সেই অপহৃত ধনকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন জাহাঙ্গীর নিজের নিঃসপত্ন অধিকারে। শের আফগান নিহত—কণ্টক অপসারিত। মিহরুন্নিসাকে নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে। কতো সাধ্য-সাধনা করেন জাহাঙ্গীর। কিন্তু স্বামীহন্তার প্রতি মিহরুন্নিসা বিমুখ। অথচ ভিতরে ভিতরে ক্ষমতার একটা লোভ তখন এই বিধবাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। জাহাঙ্গীরও ক্রমাগত সেই ইচ্ছায় বারি সিঞ্চন করে চলেছেন। তবুও মিহরুন্নিসা মুখ ফিরিয়ে। কৌশলে ফাঁদে তাঁকে তখন বন্দী করতে চেয়েছেন জাহাঙ্গীর। আর্জুমন্দ বেগম হলেন মিহরুন্নিসার নিজের ভাইঝি, ইতিকাদ খাঁর কন্যা। অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জাহাঙ্গীর মিহরুন্নিসাকে বোঝাতে চাইলেন—সুন্দরী, আমাকে ভজনা কর, নইলে তোমার ভাইঝির কপালে অশেষ দুর্গতি। এটা শুধু তাঁর কথার কথা রইল না, সত্যিই তিনি ২৯ অক্টোবর ১৬১০ তারিখে পুত্রের বিয়ে দিয়ে বসলেন মির্জা মুজফ্‌ফর হুসেন সফাবির মেয়ের সঙ্গে। ঘরে এলেন পুত্রবধূ হয়ে কান্দাহারী বেগম—খুররমের প্রথম স্ত্রী।

এবার বুঝি মন গলল মিহরুন্নিসার। সন্তানের বিয়ের পর জাহাঙ্গীর মিহরুন্নিসাকে বিয়ে করলেন ১৬১১-এর ২৫ মে। মিহরুন্নিসা হলেন নূরমহল থেকে নূরজাহান, জগতের আলো। এবার তিনি জাহাঙ্গীরকে বললেন, আর্জুমন্দকে ঘরে আনো। আর খুররমকে বুঝিয়ে দিলেন শুধু ভাইঝিটিকেই তিনি দিচ্ছেন না—তাঁকে আরও দিচ্ছেন বারো হাজারী জাত এবং পাঁচ হাজারী সোয়ারের মনসবদার। খুররমের ভাগ্য এখন নূরজাহানের করতলগত—একথা যেন ভুলে না যায় খুররম।

এর প্রায় মাসখানেক পরেই সেই ঐতিহাসিক মিলনের লগ্ন এগিয়ে এল। পাঁচ বছর তিন মাস আগে যে বাগদান সম্পাদিত হয়েছিল তার পূরণ ঘটল। পনেরো বছরের সেদিনের খুররম এখন কুড়ি বছর তিন মাস। কিশোরী আর্জুমন্দও বেড়ে ওঠে এখন ভরা যৌবন—উনিশ বছর এক মাস। ইতিমাদুদ্দৌলার (গিয়াস) পুত্র ইতিকাদ খাঁর কন্যা আর্জুমন্দ-এর এই বিয়েতে রাত কাটাতে স্বয়ং সম্রাট এলেন ১৮ই খুরদাদ বৃহস্পতিবার খুররমের বাড়িতে। এক দিন এক রাত সেখানে থাকলেন। আনন্দমগ্ন খুররম পিতা, বেগম, মা, সৎমা হারেমের বাঁদিদের আর আমিরদের নানা মণিমুক্তা উপহারে তোষণ করলেন। অজস্র অর্থব্যয়ে বিবাহ-উৎসব সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ আনন্দোৎসবে পর্যবসিত হল। শোভাযাত্রা, বাজী পোড়ানোর উজ্জ্বলতায় দিন ও রাত্রি মোহিত হল। সমগ্র আগ্রা নগরীও যুবতীর শোভায় শোভিতা। ধন্য হল ১৬১২-এর এপ্রিলের সন্ধ্যা। এর পাঁচ বছর পরে খুররমের হারেমে এলেন তাঁর তৃতীয় বেগম—সুখ্যাত আবদুর রহিম খান খানানের পুত্র শাহনওয়াজ খানের কন্যা। কিন্তু এই সব পত্নীরা (এবং অবশ্যই রক্ষিতাগণ) কি আর্জুমন্দের সৌভাগ্যসূর্যকে রাহুগ্রস্ত করতে পারল? পারেনি। মুঘল বংশের ইতিহাসে এমন প্রায় একপত্নীলগ্ন সম্রাট পুত্র আর কেউ হতে পারলেন না। স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকারে আর্জুমন্দ বানুর দিন কাটাতে লাগল। না, ভুল বললাম—এখন তিনি আহমদনগর বিজয়ী শাহজাহানের পত্নী। নিজেও আর আর্জুমন্দ নন—মহলের প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন, সন্তানবতীও হয়েছেন—এখন তিনি মমতাজমহল—মমতাজ-ই-মহল 'chosen one of

the palace'. সুন্নী-শিয়ার দূরত্ব গেছে দূরে—গভীর প্রেমে মগ্ন দোঁহে—জীবন-যৌবন সফল করি মানলু—দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা।

মমতাজ-এর গভীর ভালবাসার অত্যুজ্জ্বল আলোকে শাহজাহানের অন্য পত্নীরা আবৃত হয়ে গেছেন। প্রথম মহিষী কান্দাহার বেগমের একটি কন্যা জন্মে ১৬১১-এর ১২ই আগস্টে, রুকিয়া বেগম এই কন্যাটিকে মানুষ করেন। কিন্তু এই পারহেজ বানু নামে সম্রাট কন্যাটি সম্পর্কে কতটুকুই বা আমরা জানি।

মমতাজই শাজাহানের সর্বস্ব। তাঁর প্রেম এবং প্রেমের অত্যাচার সবই তিনি তাঁকে দিয়ে ধন্য সার্থক। এরই ফলে শাজাহানের চোদ্দটি সন্তানবাহনের দুঃসহ বেদনা এই সর্বকালের সুন্দরী শ্রেষ্ঠাকে বহন করতে হয়েছিল। আর ক্রমাগত এই শারীরিক ক্ষয় তাঁকে নিয়ে চলেছিল মৃত্যুর অবধারিত লক্ষ্যে। চোদ্দটি সন্তানের সাতটি মাত্র জীবিত ছিল তাঁর জীবৎকালের মধ্যে। চোদ্দটির মধ্যে আটটি ছিলেন পুত্র, ছটি কন্যা সন্তান। প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন একটি কন্যা—নাম, খুব সম্ভব চমানি বেগম। জাহানারা (১৬১৪-৮১) তাঁর দ্বিতীয় সন্তান, জন্ম হয় আজমীরে ২৩ মার্চ ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে। দারা শিকোহ তাঁর তৃতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র (মৃত্যু ১৬৫৯) জন্মগ্রহণ করেন ২০ মার্চ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরে। এই আজমীরেই জন্মগ্রহণ করেন শাহ সুজা (মৃত্যু ১৬৬০) ২৩ জুন ১৬১৬ তারিখে। তৃতীয় কন্যা সন্তান রোশন আরা বেগমের জন্ম বুরহানপুরে (মৃত্যু ১৬৭১), জন্ম তারিখ ২৪ আগস্ট ১৬১৭। ষষ্ঠ সন্তান ঔরংজীব (মৃত্যু ১৭০৭) জন্মগ্রহণ করেন ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর। তাঁর জন্মস্থান দোহাদ। দশম সন্তান মুরাদের (মৃত্যু ১৬৬১) জন্মস্থান রোহটাস, জন্ম তারিখ ২৯ আগস্ট ১৬২৪। ১৩ এপ্রিল ১৬৩০-এ জন্ম-করেন স্বল্পজীবী কন্যা হাস্‌ন্ আরা বেগম বুরহানপুরে। বুধবার শেষ সন্তান এল কন্যারূপে ৭ জুন ১৬৩১-এর রাতে। মা এবং চতুর্দশ সন্তানটির মৃত্যুলগ্ন সূচিত হল সেইক্ষণেই।

১৬১২ থেকে ১৬৩১—উনিশ বছরের গাঢ় দাম্পত্য জীবনে চোদ্দটি সন্তানের উপহার শাজাহানকে তৃপ্ত করতে পেরেছিল কিনা জানি না,

কিন্তু অবধারিত ক্ষয় মমতাজকে ক্লিন্ন করে তুলছিল ক্রমাগত। মমতাজ-মহল সম্রাজ্ঞী হলেও তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি মা। ইতিপূর্বে ছ'টি সন্তানের অকালমৃত্যুর বেদনা তাঁকে সইতে হয়েছে গোপনে—ঠোঁট চেপে। শাজাহান সে বেদনায় সঙ্গী হয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু অপরিসীম স্নেহে শ্বশুর জাহাঙ্গীর পূর্ববৎ পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন সহানুভূতির অজস্র সান্ত্বনা নিয়ে। শোকবিহ্বল জাহাঙ্গীর নিজের আত্মজীবনী পর্যন্ত মমতাজের কন্যা চমানি বেগমের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে লিখতে পারেননি। ইতিমাদুদ্দৌলা তাঁর আদেশে লিখেছিলেন—'এই হৃদয়বিদারী দুঃখবর্ধন-কারী ঘটনা আল্লার ছায়া সেই পবিত্র পুরুষের (জাহাঙ্গীরের) কি অবস্থা ঘটেছে সে সম্বন্ধে আর কি লিখব। পৃথিবীর আত্মার (জাহাঙ্গীর) যখন এই অবস্থা তখন আল্লার অন্য সেবকদের (খুররাম ও তাঁর পত্নী)—যাঁদের জীবন এই পবিত্র প্রাণের সঙ্গে আবদ্ধ—তাঁদের মনের অবস্থা কি হতে পারে?' মেয়ে চলে গেল—মমতাজমহল ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারেননি। মেয়েও গেল ১৫ জুন ১৬১৬ আর তার মাত্র আট দিন পরে তিনি জন্ম দিলেন শাহসুজার। মৃত্যু ও জন্মের আলো-ছায়ায় মমতাজের জীবনের সায়াহ্ন তাই ধীরে ঘনিয়ে এল। অঙ্গুরীবাগের বাগানে মমতাজের পদচারণা আগেই বন্ধ হয়েছিল, এবার স্তব্ধ হল চিরতরে।

উনিশ বছর দাম্পত্য জীবনে মমতাজমহলের প্রেম নূরজাহানের চেয়ে সুগভীর ছিল। রাজ্য আর অর্থের লালসা তাঁকে ক্ষুদ্রচেতা করতে পারেনি। তাই দক্ষিণভারত থেকে ওড়িশা, বাংলা-বিহারে স্বামীর প্রেমের অতল বৈভবে মগ্ন থেকে দুঃখময় শিবির জীবনকে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন। কোন সময়েই তিনি শূন্য গর্ভ থাকতেন না, স্বামীর প্রণয়ের জান্তব চিহ্ন ধারণ করেই তাঁকে শিবির জীবনের পীড়ন-উদ্বেগ সহজভাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু একটা সান্ত্বনা ছিল তাঁর। তাঁর গর্ভজাত পুত্র-কন্যাই শাজাহানের অন্তরের স্বীকৃতি পেয়েছে সর্বাধিক—তাঁর সপত্নীদের সন্তানেরা নয়। একটি পত্নীতে এমন সমলগ্ন থাকাটাই বোধহয় তাঁর প্রতি শাজাহানের প্রেমের একনিষ্ঠতার জাজ্বল্য উদাহরণ। শাজাহান যে মদ্যপানে অনাসক্তি দেখাতেন তার কারণ তিনি মমতাজের

রূপমদে মগ্ন ছিলেন আকণ্ঠ। সাম্রাজ্যের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই আগ্রাদুর্গের মধ্যে মমতাজকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাসাদে স্থাপন করে শাজাহান প্রেমের সিংহাসন রচনা করেছিলেন।

তাঁর বত্রিশ বছরের রাজত্বে অর্ধেকের বেশি সময় শাজাহানকে কাটাতে হয়েছে রাজধানী থেকে দূরে। এমনি ঘুরতে ঘুরতে ১ মার্চ ১৬৩০-এ তিনি সপরিবারে এলেন বুরহানপুরে। এখানে দু বছর স্থিতির মধ্যে মমতাজমহল পর পর দুটি কন্যার জন্ম দিলেন। শেষের দুর্ভাগা কন্যাটি এল ১৬৩১-এর ৭ই জুনের রাত্রে।

দিনটা ছিল বুধবার। এবার আর প্রসবের ধকল সইতে পারলেন না রক্তহীন চতুর্দশ সন্তানের রূপবতী জননী মমতাজ। প্রসবের পর-মুহূর্তেই তিনি ক্রমাগত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যেতে লাগলেন। সপ্তদশী কন্যা—ঠিক মায়ের মতই দেখতে জাহানারা বেগম—মায়ের পাশটিতেই ছিলেন। মমতাজের কণ্ঠ যেন কোন অতল থেকে তাঁকে পাশে ডাকল—বলল—ওঁকে একবার ডেকে দে তো মা। জাহানারা ছুটে গিয়ে পিতাকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনলেন। ভীতত্রস্তজড়িত পদে শাজাহান এসে দেখলেন—এ কী তাঁর আদরের আলিয়া বেগম এমন নিস্পন্দ কেন? গভীর প্রেমে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয়তমার শীতল পদ্মহাত দুটি। একরাশ ক্লান্তি জড়ানো অসিতকৃষ্ণ চক্ষুপল্লব দুটি কোনোক্রমে একটু উন্মোচিত করে দূরাগত স্বরে মমতাজ স্বামীকে বললেন—আমার তোমার ছেলে-মেয়েরা রইল তুমি দেখো, আমি যাই, যেতে দাও, যাই।

শাজাহান চুপ করে বসে রইলেন। তিনি কি বুঝতে পারছেন না তাঁর মালিক-ই-জামানি তাঁকে ছেড়ে দিনদুনিয়ার মালিকের চরণপ্রান্তে আশ্রয় নিতে কখন চলে গেছেন। গভীর প্রেমে শাজাহান কি তখনও দেখছেন তাঁর মমতাজমহল—তাঁর আদরের আলিয়া বেগম—একটু যেন সাদা হয়ে গেছেন—গালের দু পাশের সেই লালিমা কেমন যেন ফিকে হয়ে গেছে। ও বোধহয় ঘুমুচ্ছে। আহা ঘুমুক···

জাহানারার অস্ফুট কান্নার আওয়াজে শাজাহানের বুঝি সম্বিৎ ফিরলো। তাহলে সে নেই। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। তারপর সমগ্র

রাজ্য কাঁদল—শাজাহান আর দরবারে যান না। পুত্রেরা বিদ্রোহ করে ধ্বংস হল। তাজমহল নির্মিত হল—প্রেমের সমাধি।

তবে কি মমতাজ শুধু শাজাহানের পত্নী প্রিয়তমা আর তাঁর সন্তান-ধারণের পাত্রীবিশেষ? এতেই মমতাজ শেষ? তাজমহলের আভ্যন্তরীণ প্রেমের সুরভি কি অতিরিক্ত কোনো কথা বলে না? বলে বই কি! কি বলে?

মমতাজ সুন্দরী ছিলেন? সাজাতে ভালবাসতেন? সাজলে তাঁকে ঠিক বেহেস্তের হুরী মনে হত? আটত্রিশ বছরে চোদ্দটি সন্তানের জননীর যৌবন মনোলোভা ছিল? না, মমতাজ এসবের উর্ধ্বে ছিলেন। শাজাহান তাঁকে মালিক-ই-জামানি উপাধি দিয়েছিলেন—এমন কি তাঁকে রাজকীয় শীলমোহরের অধিকারিণী করেছিলেন। মমতাজ নিজের নামে ফরমানও ব্যবহার করতেন। কিন্তু ক্ষমতা তাঁকে মদমত্ত করেনি। অপরিসীম দয়া সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল। কত অনাথ শিশু, কত বিধবা রমণী, কত অন্ধ আতুর প্রতিদিন নিয়মিত তাঁর দানে পুষ্ট হতো—তার হিসাব ইতিহাস রাখেনি। তাঁর প্রধানা সহচরী সতী-উন-নিসা খানুম তাঁর সমস্ত বদান্যতায় তাঁকে উৎসাহিত করতেন প্রবলভাবে। আজও এই সহচরীর পার্শ্ববর্তী কবরে থেকে মমতাজ সে-সব দিনের কথা বলেন কিনা যদি শুনতে পেতাম!

পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন কি এই বিদুষী মহিলা? স্নেহ ছিল তাঁর অপরিসীম, কিন্তু সে স্নেহে শাসনের বন্ধন ছিল না। কেবল দারাশিকোর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তিনি।

আসলে মমতাজমহলের অভ্যন্তরে একটি মানুষই চিরকাল আধিপত্য করতে পেরেছেন তাঁর প্রেমের রাজদণ্ডহাতে। তাঁরই জন্য তিনি শিবিরে শিবিরে ঘুরেছেন। তাঁরই হাত থেকে বার বার উপহার পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছেন। সেই উপহার ১৬৩০-এর অভাবিত দুর্ভিক্ষে বিলিয়ে দিয়ে কৃতার্থ বোধ করেছেন। তাঁরই প্রেমে শিয়া ধর্মের সঙ্গে সুন্নীর বিষমধাতুতে মিলন ঘটেছে। তাঁকেই মমতাজ ধর্মব্যাপারে প্রভাবিত করেছিলেন—সেজন্যেই কি শাজাহান এত হিন্দু এবং খ্রীষ্টবিরোধী হয়ে

পড়েছিলেন ? অথচ মমতাজের অন্তরে তো একটি পবিত্র ভক্তিমতি প্রাণ নিবাস করতো গভীর বিনম্রতায়, উপবাস-আচারে নিজেকে পবিত্র করে রাখতো।

একবার পোর্তুগীজ দস্যুরা মমতাজমহলের ছুটি বাঁদীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। শাজাহান তাদের কি শাস্তিটাই না দিয়েছিলেন। তাঁর গভীর প্রেমের জন্যই শ্বশুর আসফ খাঁকে শাজাহানের রাজকীয় পাঞ্জা ব্যবহার পর্যন্ত করতে দিয়েছিলেন। তাঁর অন্য স্ত্রীরা শাজাহানের শক্তি ক্ষয় করেছিল মাত্র।

বহু চেষ্টা করেও আকবর রাজপুতদের ধ্বংস করতে পারলেন না। পুত্র জাহাঙ্গীর এখন পিতার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। সবচেয়ে দুর্বিনীত ঐ মেবার রাজ্যটি। পিতা জাহাঙ্গীরের আদেশে বারো হাজারী মনসবদারী নিয়ে পুত্র শাজাহান চলেছেন রাজপুতদের উচিত শিক্ষা দিতে। সে ১৬১৪ সালের কথা। সঙ্গে গেছেন প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহল। তাঁকে আজমীরে রেখে শাজাহান গেছেন প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে। একদিন শিবিরে ফিরে এসে শুনলেন মমতাজমহল একটি ঘর-আলো-করা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আগের সন্তানের অকাল-মৃত্যুর শোক ভুলে রাজপুত্র শাজাহান পিতাকে কন্যাসন্তানের জন্মের সংবাদ পাঠালেন আনন্দে উদ্বেল হয়ে। জাহাঙ্গীর সানন্দে নবজাতিকার নামকরণ করলেন জাহান-আরা—জগতের অলঙ্কার।

জাহানারার জন্ম হয়েছিল আজমীরে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ, চৈত্রের তীব্র খরায় ঊষর এক জমিতে। জন্মলগ্নেই বুঝি রুদ্র প্রচণ্ড হয়ে তাঁর জন্মের পর পুরো সাতষট্টি বছর ধরে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিলেন নিষ্করুণভাবে। ১৪ বছরে পা দেবার আগেই পিতামহ জাহাঙ্গীর মারা গেছেন। শাজাহান রাজা হয়েছেন আর আর জাহানারা রাজদুহিতা হয়েছেন সত্য। কিন্তু রাজদুহিতার শয্যাস্থল গোলাপের পাপড়ির আস্তরণ হয়ে উঠল না। হয়ে উঠল গোলাপের কাঁটার শয্যাভূমি। যে মাকে জাহানারা সর্বত্র ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন, মায়ের সব কাজকে নিজের কাজ ভেবে অংশ নিয়েছেন, জাহানারার মাত্র সতেরো বছর বয়সে সেই মমতাজমহল ঠিক তাঁর চোখের সামনে দিয়েই চলে গেলেন। এক রাজনৈতিক ঘনঘটাময় সাম্রাজ্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা শুধু নয় জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবেই জাহানারাকে বেঁচে থাকতে হল।

আকবর শাহের বিধানে মোগল হারেমের সম্রাটকন্যারা পরিণীত জীবনের সুখ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত। অথচ জাহানারার বুকে ভাল-

বাসার জন্যে কী তীব্র ক্ষুধা। বদখশান-রাজ মীর্জা শাহরুখের তৃতীয় পুত্র নজবৎ খাঁ ছুটি চোখে গভীর প্রার্থনা ঝরিয়ে জাহানারার পাণিপ্রার্থী। স্বয়ং দারাশুকোরও গভীর ইচ্ছা জাহানারা নজবৎ খাঁকে বরণ করে নিক মোগল দরবারের প্রথাকে অস্বীকার করে। কিন্তু তা আর হল কই? কিংবদন্তী অন্য কথা বলে।

আগ্রা প্রাসাদের অঙ্গুরীবাগে এখন এসে হাজির হয়েছেন তাঁর প্রাণের প্রিয় বুলবুল—শাজাহানের বিশ্বস্ত রাজপুত বুন্দীরাজ ছত্রশাল—জাহানারা যাঁকে আদর করে ডাকেন—আমার ছুলেরা, আমার রাজা। কতদিন অঙ্গুরীবাগের সবুজ গালিচা ছুলেরার গানে উত্তাল হয়ে উঠত। প্রথম দিনেই মহলের ঝরোখাতে ছুলেরাকে দেখে জাহানারার মনে হয়েছিল তিনি নিজে বুঝি দময়ন্তী আর রাজা নল এসেছেন তাঁকে স্বয়ংবরে বরণ করে নিয়ে যেতে।

সেই ঝরোখা থেকেই নিবেদিত হত পবিত্র প্রেমের প্রস্রবণ। তাঁরা জানতেন, সম্ভব নয় ইহজীবনে তাঁদের মিলন। তবুও ঝরোখার গায়ে মুখ লাগিয়ে উচ্চারিত হত প্রেমের মৃদু আলাপন। বুন্দীরাজ উচ্চারণ করতেন তাঁর জীবন উৎসর্গের সংকল্প। শুভ্র পরিচ্ছদে স্বর্ণখচিত কোমর-বন্ধে তাঁর রাজপুত গর্ব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

ছুলেরাকে স্বপ্ন দেখতেন জাহানারা। কখনও ভাবতেন লিখবেন চিঠি, লিখতেনও। অঙ্গুরীবাগ অথবা জেসমিন প্রাসাদ থেকে সে সব চিঠি বয়ে নিয়ে যেতো তাঁর বিশ্বস্ত 'নাজীর'। উত্তর যখন আসতো পড়-বার জন্যে চলে যেতেন দূর মসজিদের নিরালায়। তাঁর কবিপ্রাণে উঠত প্রেমের অস্ফুট গুঞ্জরণ। একবার ঘটে গেল একটা বিপত্তি। তাঁর প্রাণের ছুলেরাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে। পথের মধ্যে চিঠি গেল চুরি হয়ে। জাহানারার সে কি অভিমানের কান্না। অবশেষে ছুলেরা, তাঁর রাখীবন্ধ ভাই, ছত্রশাল এলেন। উপহার দিয়ে গেলেন বিচিত্র কারুকার্যের কাঁচুলি। দরবারে এসব কথা উঠল। উঠল ছুলেরা গান গেয়ে জাহানারাকে করেছেন অভিভূত। ফলে ছত্রশাল হলেন অপমানিত। অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনুকে ঝরোখা থেকে

দেখে জাহানারার বুক ফেটে যায়। এরই মধ্যে দারা নিয়ে এসেছেন নজবৎ খাঁ-এর সঙ্গে জাহানারার বিয়ের প্রস্তাব। জাহানারার দুটি চোখে ভেসে ওঠে ছুলেরার দৃপ্ত চন্দ্রানন। নজবৎকে তাঁর মনে হয় বিষধর সর্প। আনসারীর কাব্য পড়তে পড়তে অন্তরে সান্ত্বনার সন্ধান করেন জাহানারা। আর সান্ত্বনা পান প্রিয় সখী কোয়েলের কাছে হৃদয় উজাড় করে দিয়ে। অবশেষে এল একটা প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। ভালোবাসাকে তাঁরা নিয়ে গেলেন এক অপার্থিব অনুভবে। ছুলেরার হাতে গভীর প্রেমে জাহানারার বেঁধে দিলেন পবিত্রসাক্ষী রাখী। তাঁর বস্ত্র হল আসঙ্গলিপ্সায় চুম্বিত। জাহানারা তাঁকে আরও দিলেন একটি মুক্তাখণ্ড—উষ্ণীষের মণিকোঠায় স্বপ্রেমে তাকে স্থাপন করলেন বুন্দীরাজ ছত্রশাল। দুজনের উত্তপ্ত অধরে মোহরাঙ্কিত হল তাঁদের পবিত্র প্রেম। জাহানারা তাঁর আত্মকাহিনীতে তাই লিখেছেন—কোন বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়কে নিকটতর করতে পারত না।

শেষে এল অনন্ত বিরহ। যুদ্ধক্ষেত্রে বুঝিবা নজবৎ-এর তরবারির আঘাতে একদা রাণা ছত্রশালের জীবনদীপ হল নির্বাপিত। জাহানারা সব শুনে যেন অনুভব করলেন—রানা ছত্রশাল তাঁকে কোনোদিন ত্যাগ করবেন না—করতে পারেন না।

জীবনের এই নিঃসঙ্গতা জাহানারাকে উদ্বুদ্ধ করল আত্মানুসন্ধানের উদ্যোগে। মা নেই, ছুলেরা নেই, পিতার চারপাশে বিদ্রোহ পুত্রদের অবিশ্বাস অন্ধকারে ঘনায়মান। জাহানারা কি শুধুমাত্র দর্শকের নীরব ভূমিকা পালন করবেন? তিনি শুধু কুমারীর প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন কিভাবে? তিনি যে রাজকুমারীও। রাজ্যের ভালমন্দের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিলেন একাকার করে।

আসলে জাহানারার জীবনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ কোন প্রার্থিত বস্তু ছিল না। এ-ও তাঁর এক ভালবাসার দায়। ভালবাসতে চেয়েছেন বিপত্নীক প্রেমিক পিতাকে আর অবশ্যই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই দারাশুকোকেও। এদের ভালবাসতে গিয়ে ভালবাসা হারালেন আর তিন ভাইয়ের—বিশেষ করে ঔরংজীবের। আর বোন রোশেনারার। এ তো সাধারণ মানুষের

ভালবাসা বা বিরোধিতার কথা নয়, মোগল রাজবংশের সঙ্গে এই ভালবাসা-বিরোধিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

জাহানারা বাবার নয়নের মণি, শাজাহানও কন্যার নয়নের নিধি। বিজয়ী শাজাহানের অভিষেক সম্পন্ন হতে চলেছে সেদিন। পাঠ করা হয়েছে খুতবা তাঁর নামে। দরবার হলের সেই প্রভূত আড়ম্বর-উৎসবের শেষে শাজাহান ফিরে এসেছেন অপরাহ্ণে হারেমের অভ্যন্তরে। আর্জুমন্দ বানু বেগম, জাহানারা আর অন্য অন্তঃপুরিকারা সোচ্ছ্বাস আনন্দে তাঁকে করেছেন অভিষিক্ত। পিতাকে জাহানারা উপহার দিয়েছেন উদ্গত কারুকার্যসমন্বিত একটি অষ্টকোণ সিংহাসন সার্ধ দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে। জাহানারাকে পিতা উপহার দিলেন এক লক্ষ আশরফি, চার লক্ষ টাকা। বার্ষিক ভাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন ছ'লক্ষ টাকা যার অর্ধেকটা তিনি পেতে লাগলেন নগদে। বাকীটা জায়গীরের মাধ্যমে।

তারপর থেকেই সাতাশ বছর ধরে পিতার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এসে গেছে জাহানারার উপরে। মমতাজমহল চলে গেছেন—এখন জাহানারা মুখে অন্ন না দিলে শাজাহানও খান না।

এরই মধ্যে ঘটে গেছে এক অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ। গোয়ালিয়র-নিবাসিনী নর্তকী গুলরুখ বাই নেচে চলেছেন জাহানারার অন্দরমহলের এক নবোদ্ভূত নৃত্যভঙ্গিমায়। পরিতৃপ্ত জাহানারা নাচের শেষে তাঁর প্রিয় নর্তকীকে অভিনন্দন জানাতে চললেন এক অলিন্দপথ বেয়ে। গায়ে তাঁর আতরমাখানো চুমকি-ওড়না। পথের পাশে জ্বলে চলেছে চেরাগের বাতিদান। হঠাৎ আগুন ধরে গেল গুলরুখের অঞ্চলপ্রান্তে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আগুন ধরে গেল জাহানারার সূক্ষ্ম মসলিনের পরিধেয় বস্ত্রেও। সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে গেল জাহানারার সমস্ত অঙ্গ। শাজাহান সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। তাঁর বড় আদরের বড় মেয়ে। মুখটি একেবারে বসানো মমতাজমহল, একেবারে শয্যালীন। প্রতিদিন এসে রাজার গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়ে পিতার স্নেহে অভিষিক্ত করে ক্ষতস্থানে প্রদান করেন আরোগ্যকারী মলম। প্রতিদিন জাহানারার বালিশের নীচে রাখা হতে লাগল এক সহস্র মুদ্রা।

সকালে সে সমস্ত ধন বিতরণ করা হতে লাগল দরিদ্র আর আতুরদের মধ্যে। মুক্তি পেল অর্থাপরাধে দণ্ডিত রাজব্যক্তিগণ। প্রায় ন'মাস ধরে চলল যমে মানুষে টানাটানি। রাজবৈদ্য ব্যর্থ হলেন, পরাস্ত হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা। অবশেষে আরিফ নামে এক ক্রীতদাস একটি মলম তৈরি করে এনে দিলেন দেশীয় গাছগাছড়া থেকে। তাতেই ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগলেন জাহানারা।

ঔরংজীব—পিতার বিরোধিতা করে বিরাগভাজন হয়েছিল। রোগ-মুক্ত জাহানারা পিতাকে অনুরোধ করলেন তাঁকে ক্ষমা করার জন্যে। ঔরংজীব ক্ষমা পেয়ে পূর্বমর্যাদা ফিরে পেলেন। কিন্তু শাজাহানের জীবনের দুর্গতি তাতে বন্ধ হল না। ঔরংজীবের কূটচক্রে তিনি বন্দী হয়ে বাকী জীবন প্রাসাদেই কাটাতে বাধ্য হলেন। জাহানারা নিজে গিয়ে ঔরংজীবকে এই ভ্রাতৃবিদ্রোহ আর পিতৃদ্রোহের খেলায় মাততে নিষেধ করলেন। ধীরে ধীরে শাজাহান যেন উন্মাদ হয়ে পড়লেন। তাঁর একমাত্র সঙ্গী তখন ধর্ম আর কোরাণ। কনৌজের ধর্মপ্রাণ সঈদ মুহম্মদ তখন তাঁর নিত্যক্ষণের সঙ্গী। আর আছেন কন্যা জাহানারা।

পিতার মতই ভালবাসতেন বড় ভাই দারাশুকোকেও। মমতাজমহল দারার বিয়ের কথাবার্তা বলে গেছিলেন, দিয়ে যেতে পারেননি। মায়ের অসমাপ্ত কার্য জাহানারা সগৌরবে পালন করেছিলেন।

কিন্তু দারাকে ভালবাসতে গিয়ে তিনি পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন ঔরংজীবের বিষনজরে। জাহানারা বার বার চেষ্টা করেছেন তাঁর এই ক্ষমতালিপ্সু বিদ্রোহী ভাইটিকে বশে আনতে। কিন্তু প্রতিবারই বুঝি ব্যর্থ হয়েছেন। জাহানারা পুড়ে যাবার বেশ কিছুদিন পর অবশ্য ঔরংজীব দিদিকে দেখবার জন্য দক্ষিণাপথ থেকে আগ্রা এলেন ২রা মে তারিখে। এখানে আসার পর তাঁর সমস্ত পদমর্যাদা শাজাহান কেড়ে নিয়েছিলেন বটে কিন্তু জাহানারার মধ্যস্থতায় আবার তা ফিরে পান। ১৬৪৫-এর ১৬ ফেব্রুয়ারী আবার তিনি গুজরাটের গভর্নর হন।

কিন্তু শাজাহানের প্রবল অসুস্থতার সময়েই ঔরংজীবের বিরোধিতা তীব্রতর হয়েছিল। জাহানারা বাধ্য হয়ে তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন—

'সম্রাট এখন সেরে উঠেছেন ও নিজে রাজ্য চালাচ্ছেন। এসময়ে কোনো অশান্তি তাঁর অভিপ্রেত নয়। তোমাকেও লিখি যুদ্ধ করাই যদি অভিপ্রেত হয় তবে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফল ভাল হবে না—অখ্যাতি ছাড়া। বৈরিতা ত্যাগ করে মুসলমান ধর্মানুসারে পিতৃসম জ্যেষ্ঠাগ্রজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উচিত নয়। তা অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করবে। তুমি বিরত হও। তোমার বক্তব্য পিতা জানলে তিনি খুশী হবেন।'

বলাবাহুল্য কাউকে খুশী করার জন্য ঔরংজীব কখনও মতের পরিবর্তন করতেন না। বক্‌শী মুহম্মদ ফারুকের হাতে এ চিঠি পেয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ঘোষণা করে তিনি পিতাকে একটি চিঠি দিলেন। পরে দারাকে পরাস্ত করে পিতাকে বন্দী করে জাহানারাকে ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক্ করে দিলেন।

শেষে একদিন শাজাহান চলে গেলেন জাহানারাকে প্রায় নিরাশ্রয় করেই। ১৬৬৬-এর ফেব্রুয়ারীতে ঔরংজীব আগ্রা এলেন ভারতের সিংহাসনের নিঃসপত্ন অধিকারী হয়ে। এসেই তাঁর হৃদয়ের পূর্বতন কৃতজ্ঞতাকে জাগ্রত করেই বুঝি জাহানারাকে রাজ্যের 'ফার্স্ট লেডি'র সম্মানে ভূষিত করলেন। সমস্ত রাজন্যবর্গের কাছে আদেশ পাঠালেন প্রতিদিন জাহানারার আবাসে গিয়ে কুর্নিশ জানাতে। তাঁকে উপঢৌকন দিতে। খোজারা গৃহমধ্যস্থ সেই অদৃশ্য নারীকে জানাতে লাগল প্রতিদিবসের সেলাম। অভিষেকের দিনে ঔরংজীব তাঁকে দিলেন প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার পরিমাণের স্বর্ণখণ্ড। তাঁর বার্ষিক ভাতা বেড়ে দাঁড়ালো সতেরো লক্ষ টাকায়। সারাজীবন ধরেই এই সম্মানের অধিকারিণী হয়ে রইলেন। দারার অনাথ কন্যার সঙ্গে ঔরংজীবের তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ আজমের বিয়ে দিলেন খুব ধুমধামের সঙ্গে। মমতাজের মৃত্যুর পর সাতাশ বছর ধরে জাহানারা পেয়েছিলেন অন্দরমহলের পূর্ণ দায়িত্ব। তাঁকে ডাকা হত 'বেগম সাহিব' নামে। পরে উন্নীত হলেন 'পাদিশাহ বেগমে'র সর্বোন্নত পদমর্যাদায়।

কিন্তু একদিন নূরমঞ্জিলের সমস্ত প্রাধান্য থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হল জাহানারাকে। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে রমজান

মাসে তিনি বুঝি চলে গেলেন পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হতে। তিন-দিন দিল্লীতে নহবতের বাজনা আর বাজল না। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁকে সম্মানিত করলেন মরণোত্তর যুগসম্রাজ্ঞী—'সাহিবৎ-উজ-জমানী' উপাধিতে। জাহানারার দেহ পুরোনো দিল্লির শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার বিশাল সমাধি ভবনের প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ হল। এই দেহ সমাধিস্থলে বহন করে আনা হয়েছিল বিশাল শোভাযাত্রা করে। এখন কবরশীর্ষে শ্বেতমর্মরপ্রস্তরে ক্ষোদিত হল জাহানারার স্বরচিত সমাধিলিপি ঃ

বগায়ের সবজ্ না পোশদ্ কসে মজারে মরা
কে করব-পোষে গরিবাঁ হামিন গিয়া বস্ অস্ত।

—তৃণগুচ্ছ ভিন্ন আমার সমাধির উপর কোন আস্তরণ করো না। এই তৃণগুচ্ছই অবনমিতার সমাধির আস্তরণ হোক।

রোশেনারার কথা

রোশেনারা শাজাহানের একমাত্র কন্যা নন। তাঁর একটি বোন জীবিত ছিল—হাসন আরা বেগম। এবং তাঁর সুপরিচিত দিদিটি—জাহানারা। জাহানারা আর রোশেনারার মধ্যে বয়সে পার্থক্য মোটামুটি তিন বছর পাঁচ মাসের। জাহানারার ঠিক পরের ভাইটি হলেন দারাশুকো আর রোশেনারার পিঠোপিঠি ভাই হলেন ঔরংজীব। বেশ একটা মজার ব্যাপার, দু বোনেই তাঁদের পিঠোপিঠি ছোট ভাইদের অসম্ভব ভালবাসতেন। আরও মজার ব্যাপার এই দুটি বোন এবং এই দুটি ভাইয়ের মধ্যে কোনো প্রকার সদ্ভাব ছিল না বলে জাহানারা যেমন সইতে পারতেন না ঔরংজীবকে, রোশেনারা তেমনি পারতেন না দারাকে। ঔরংজীব আর রোশেনারা সম্পর্কে জাহানারা নিজেই লিখেছেন, 'তারা যে দারার শত্রু—আমার শত্রু।' দারাকে ঔরংজীব বলতেন, বিধর্মী—'কাফের'। ঔরংজীবের গোপন দরবারে ধৃত দারার বিচার-প্রহসনে যখন সাব্যস্ত হল এই 'কাফেরে'র একমাত্র শাস্তি মৃত্যু, তখন বিদেশী দানিশমন্দ খান পর্যন্ত তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন। শুনে রোশেনারা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। দারার যাতে মৃত্যুদণ্ড হয় সেজন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি যে এক মায়ের পেটের বোন! তাই এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দারার মৃত্যুকে করলেন ত্বরান্বিত। সেজন্যেই তো দারা যখন কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করছিলেন তিনি তত উল্লসিত হয়েছিলেন। সে ক্রোধের উপশম ঘটল দারার নিষ্করুণ মৃত্যুতেই কি? তা-ও বুঝি নয়। নইলে দারার রূপসী কন্যা জানি বেগমকে যখন রোশেনারার কাছে পাঠানো হয়েছিল তখন রোশেনারা এই পিতৃহীনার সঙ্গে কি নৃশংস ব্যবহারই না করেছিলেন। আক্রোশটা জ্বলেই চলেছিল তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি।

অথচ উল্টোদিকের ছবিটা কেমন মনোহর। ঔরংজীবকে ভালবাসতেন প্রাণ থেকে। দরবারে যা হচ্ছে গোপনে সংবাদ নিয়ে সেগুলি সব

ঔরংজীবের কাছে চালান করে দিতেন। শাজাহানের পুত্রদের পারস্পরিক বিবাদে যিনি গোপনে ইন্ধন যোগাতেন তিনি এই রোশেনারা।

জাহানারার সঙ্গে তাঁর এমন মনোভাব কেন? তিনি দিদির মত সুন্দরী ছিলেন না বলেই কি? কিন্তু দেমাকে ছিলেন গরবিনী। ঐ রূপ নিয়েই তো কেচ্ছা করতে বাকী রাখেননি কিছু। তাঁর কামনার নিষিদ্ধ প্রকাশ অন্দরমহলের খোজারা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিল সে সময়ে।

অথচ শাজাহান কি ভালবাসতেন না তাঁর এই দুর্বিনীতা কন্যাকে? ভালবাসতেন নিশ্চয়ই, তবে জাহানারার মতো নিশ্চয়ই নয়। সম্রাট হিসেবে শাজাহান যেদিন অভিষিক্ত হয়েছিলেন দিল্লির সিংহাসনে, সেদিনে জাহানারার তুলনায় তাঁর এই কন্যাটিকে অনেক কম উপহার দিয়েছিলেন। সকলকে যথোচিত দানের পর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা মুরাদ, লুৎফুল্লাহ, রোশেনারা এবং সুরাইয়া বেগমের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন মাত্র।

আর একবার ১৬২৮-এর নওরোজ উৎসবে শাজাহান রোশেনারাকে দিয়েছিলেন ৫ লক্ষ টাকা মাত্র। সে সময়ে জাহানারা পেয়েছিলেন তাঁর চারগুণ—বিশ লাখ টাকা। রোশেনারার হিংসে হবার কথা অবশ্যই।

কাজেই তিনি হয়ে পড়েছিলেন ঔরংজীবের পক্ষপাতী। রোশেনারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ছোট ভাইটিই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। সুতরাং সিংহাসনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রকারে ঔরংজীবকে সাহায্য করতে লাগলেন। আর অন্যদিকে আগ্রার হারেম থেকে তাঁর প্রতিপক্ষদের হটাবার চেষ্টায় একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলেন। ঔরংজীবের জয়লাভের দিন যেন রোশেনারারও জয়। আবার দারার মৃত্যুদিনও তাঁর জয়ের দিন। জাহানারা লিখেছেন, 'রোশন আরা দারার মৃত্যুর পর বিজয়িনীর গৌরবে এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিল।'

১৬৫৯-এর জুন। রাজ্যাভিষেকের আড়ম্বরপূর্ণ দিনটিতে ঔরংজীব ছোড়দির এই আনুকূল্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। অন্য কোনো বোনকে যা দেননি সেই পুরস্কারে রোশেনারাকে করলেন সম্মানিত।

পুরো পাঁচটি লক্ষ টাকা তাঁর এই সহযোগী দিদিটির হাতে সুস্মিত আননে তুলে দিলেন। আর দিলেন স্বাধীন ব্যবহারের ঢালাও আদেশ। ঔরংজীবের স্ত্রীগণ ও পুত্রেরা রোশেনারার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বাস করতে লাগলেন। শাজাহানের মৃত্যুকাল পর্যন্ত রোশেনারা এমন একটি নিঃসপত্ন অধিকার ভোগ করেছিলেন। এর পরেই দুর্ভাগ্য রোশেনারার, তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিনী জাহানারা দিল্লি-সম্রাটের অন্দরমহলে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ঔরংজীব তাঁর এই কূটচক্রী দিদি রোশেনারাকে যেন আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেটাই তাঁর স্বভাব। রোশেনারা ধীরে ধীরে চলে গেলেন যবনিকার আড়ালে।

কিন্তু কেন? কি অপরাধ রোশেনারার? ঔরংজীব কি এতদূরই অকৃতজ্ঞ, যে বোন তাঁর জীবনে চলার পথে এতখানি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অগ্নিকুণ্ড এক অন্দরমহল থেকে—তাকে একেবারে পদদলিত করে দেবেন? অকৃতজ্ঞতা মোগল ইতিহাসে নতুন কোনো কথা নয়।

তবে কি রোশেনারা তাঁর ক্ষমতার সীমাহীনতায় পৌঁছে গিয়ে তার অপব্যবহার করছিলেন? ঘটনাটা তাই-ই।

ঔরংজীব প্রবল অসুস্থ (মে ১৬৬২)। রোশেনারা সেই সুযোগে তাঁর রাজপ্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করতে লাগলেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে বালক রাজকুমার আজমকে সিংহাসনে বসানোর চক্রান্ত করতে লাগলেন। ভাল হয়ে সব কথা জানতে পারলেন ঔরংজীব। আর রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন তিনি।

তাছাড়া একটি পর্তুগীজ দো-আঁশলা ক্রীতদাসী ভিতরের আরও কথা রটনা করলেন—রোশেনারা নাকি খোজাদের সহযোগিতায় ব্যভিচারের জীবন যাপন করে চলেছিলেন। আর ঔরংজীব নাকি সব শুনে বিষ পাঠিয়ে ভগ্নীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। বিষের প্রভাবে ফুলে ঢোল হয়ে নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছিল!

তবুও ইতিহাসে তাঁর দয়ার সাক্ষ্যেরও অভাব নেই। কিন্তু সে সব গুণ তাঁর পর্বতপ্রমাণ দোষের অন্তরালে চিরকালের জন্য অন্তরালবর্তী হয়ে গেছে।

ঔরংজীবের অন্দরমহল

অবশেষে আমরা ঔরংজীবের অন্দরমহলে এসে পড়লাম। এর পরে তাঁর কন্যা জেবউন্নিসাকে নিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করে অন্দরমহলের বাইরে চলে আসবো। ঔরংজীবের মতো ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ইসলাম যাঁর স্বপ্ন ও ধ্যান তাঁর কাছে প্রেমের উচ্ছ্বাস, দেহোপভোগের ফেনিলতা আমরা প্রত্যাশা করি না। তবুও এই গোঁড়া মুসলমানের জীবনে প্রেমের রথ এসেছিল উদ্দাম বেগে এবং বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাঁর এক পত্নী (উপপত্নী বলাই কি সঙ্গত হবে না ?) তাঁর জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গিনী হয়ে ছিলেন।

ঔরংজীব সিংহাসনে প্রথম বসেন ১০৬৮ হিজরা অব্দের ১লা জিকাদা, ২১ জুলাই ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু যুবরাজ হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। আসলে তিনি নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছিলেন, নইলে স্বাভাবিক যোগ্যতায় তাঁর তো সিংহাসনে বসার কথা নয়। কথা ছিল না, তবে কথা করে নিয়েছিলেন পিতাকে বন্দী, ভাইদের হত্যা করে। সে ইতিহাস আমাদের চর্চার বিষয় নয়।

সিংহাসনে বসবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার মতো, নারীসংযোগের ব্যাপারটিও নিজের জীবনে নিজেই আহ্বান করে নিয়েছিলেন। সে এক মনোহর আর মনোরম উপাখ্যান। বিশ্বাস হয় না, ঔরংজীবের মতো ক্ষমতাপ্রিয়, নিত্যষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রায় রসকষহীন একটা মানুষ—সংগীত এবং কাব্যকলাকে যিনি নির্বাসন দিয়েছিলেন নিজের জীবন আর রাজ্য থেকে, তিনিই একদা সংগীত আর সৌন্দর্যমুগ্ধ হয়ে তাঁর কৌমার্য সফল করেছিলেন ! সেই প্রেমের গল্পে অবশ্য একটু-আধটু রূপান্তর আছে, তবে প্রেমের কাহিনীটা ঝুটো নয়। আমরা সেই কাহিনী দিয়ে ঔরংজীবের হারেমে প্রবেশের অধিকার চেয়ে নিচ্ছি।

ঔরংজীব তখন সারা দাক্ষিণাত্যের গর্ভনর বা শাসনকর্তা। সদলবলে যুবরাজ চলেছেন তাঁর রাজধানী নবস্থাপিত ঔরঙ্গাবাদে। যাবার পথে

পড়ল বুরহানপুর। থামবেন সেখানে কদিন। স্থানীয় শাসনকর্তা সইফখানের আতিথ্য স্বীকার করলেন। আতিথ্য বলতে অবশ্য যাকে বলে আত্মীয়তা স্বীকার। সইফখান (মীর খলিল কি এর অন্য নাম ?) হলেন সম্পর্কে তাঁর মেসোমশাই। তাঁর মাসি সালিহা বানু (এই নামটা বোধ-করি ঠিক নয়, ঠিক নামটা হবে মালিকা বানু)। মালিকা বানু ছিলেন আসফ খানের মেয়ে, শাজাহানের স্ত্রী মমতাজমহলের বড় বোন।

মাসির কাছে যাচ্ছেন যুবরাজ। অতএব অন্দরমহলে যাবার জন্যে রাখ-ঢাকের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই হাঁকডাকেরও। সইফখানের অন্দরমহলও বেশ সাজানো গোছানো। ভিতরেই উঁচু পাঁচিলঘেরা ফুল-ফলের বাগান। যুবরাজ যাচ্ছেন ভিতরে। হারেমে মাসি ছাড়া অন্যান্য মেয়েরাও আছেন। কিন্তু বোনপো আসছে ভেবে হারেম সামলানোর কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না মাসি মালিকা বানু। ঔরংজীব ধীরপদে প্রবেশ করলেন মাসির অন্দরমহলে।

সোজা চলে গেলেন ফল-ফুলে ঢাকা চমৎকার উদ্যানটিতে। কিন্তু মাসির পরিবর্তে এ কাকে দেখলেন তিনি! ছিপছিপে দোহারা চেহারা বেতসলতার মতো ? দুধে-আলতা গোলা গায়ের রঙে চোখ দুটোতে কার এতো মদিরতা মাখানো! সুরমার টানে আঁখিযুগল কার এতো উজ্জ্বল! কার গলায় এতো মাধুরীর নিত্য প্রস্রবণ! দেখলেন একটি পুষ্পস্তবক-ভারনম্রা গাছের ডালটি ধরে রয়েছেন এক বেহেস্তের হুরী আর মৃদুস্বরে গেয়ে চলেছেন এক অশ্রুতপূর্ব সংগীতের লহরী। একটা বাইরের পুরুষ মানুষ এসেছে, মেয়েটির খেয়াল নেই। ও কি বেশরম!

দেখতে দেখতে মেয়েটি ফুলের গাছ ছেড়ে তরতর করে এগিয়ে গেল ফলভারনত একটা সহকার গাছের দিকে। রাশি রাশি আম ধরে আছে সে গাছে। এগিয়ে গিয়ে আশ্চর্য কৌশলে সুন্দরী একটা ডালে উঠে বসল। ব্যস্—একটা পুরুষকে একেবারে কাত করার পক্ষে যথেষ্ট এক উত্তেজনাকর দৃশ্য।

ঔরংজীব একেবারে মাটিতে বসে পড়লেন। ভুলে গেলেন তাঁর বংশ-মর্যাদা। তারপর একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ে মূর্ছা গেলেন মদনবাণে

আহত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িতে একটা সোরগোল পড়ে গেল। খবর গেল মাসির কাছে। মালিকা বানু শুয়েছিলেন। খবর পেয়েই পড়ি-মরি করে ছুটে এলেন। পায়ে তাঁর চটি নেই, বেশবাস অসম্বৃত। এসেই যুবরাজকে বুকের মধ্যে, কোলের মধ্যে তুলে নিলেন। তারপর বিলাপ করতে লাগলেন অনাগত এক সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কায়। অনেক কষ্টে, আদরে আর যত্নে তিন-চার ঘড়ির মধ্যে যুবরাজের জ্ঞান ফিরল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন মালিকা বানু আর যত পুরনারীরা। সুন্দরী কিশোরীটিও একদৃষ্টে দেখে দেখে জ্ঞান ফেরার মুহূর্তে চলে গেলেন অন্যত্র। কিন্তু জ্ঞান ফিরে এলেও ঔরংজীব বাক্যহারা। কোন্ এক যাদুমন্ত্রে যেন তাঁর জিহ্বায় এসেছে আড়ষ্টতা। মাসি যত চেষ্টা করেন কথা বলাতে—যুবরাজ ততই থাকেন নিরুত্তর।

মাসি জিগ্যেস করলেন—কি হয়েছে তোমার বাবা? তোমার কি অসুখ? তুমি কি খুবই দুর্বল? এই মূর্ছা যাওয়ার রোগ কি তোমার আগে ছিল?

ঔরংজীব নিরুত্তর থাকেন। চোখ দুটি শুধু যেন কিছু কথা বলতে চায়। যুবরাজ এসেছেন, সমগ্র অন্দরমহল আনন্দে ভরে উঠেছিল। সেই আনন্দে হঠাৎ যেন শোকের কালো অন্ধকার নেমে এল। রাত তখন অনেক গভীর—যুবরাজ সহসা ফিরে পেলেন তাঁর বাক্শক্তি। অতন্দ্র প্রহরায় মাসি বসে—কি খবর তিনি জানাবেন ভগ্নীপতি শাহনশাহ শাজাহানকে! বোনপো কথা বলতেই দারুণ খুশি হলেন তিনি।

গভীর বিষাদে নিঃশ্বাস ছেড়ে ঔরংজীব বললেন—যদি আমার অসুখটা সঠিক বলি, তবে কি তুমি আমাকে সঠিক দাওয়াইটি বাতলে দেবে?

বোনপো কথা বলতে পেরেছে আবার। খুশিতে ডগোমগো হয়ে মাসি বললেন—কি এমন জিনিস ওষুধ যাদু, যে তোমার জন্য আমি যোগাড় করতে পারবো না? তোমার জন্যে মরতে পর্যন্ত রাজি আছি আমি।

সে কথা ঔরজীব জানেন ভাল করেই। তাই 'অসুখে'র কথা সব

খুলে বললেন। বললেন ঐ কিশোরীটি, ঐ হীরাকে পেলেই আমার সব অসুখ সেরে যাবে।

শুনে মালিকা একেবারে ভয়ে কাঠ।

শুনে ঔরংজীব ঠাট্টা করে বললেন—এই তুমি আমাকে ভালবাস মাসি? মিছেই তাহলে তুমি আমার শরীরের খোঁজ নিচ্ছিলে, মিছেই আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলে? সবই দেখছি তোমার সাজানো ব্যাপার, অন্তরে অন্তরে তুমি একটুও ভালবাস না আমাকে।

মাসির দু চোখ ভরে জল এল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন—ওরে না, না, না। তোকে আমি কত ভালবাসি সে তোকে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু একথা খান সাহেবের কানে গেলে যে ভারী বিপদ হবে। হীরাকে তো কেটে ফেলবেই, আমাকেও কাটবে। দেখ্, আমি মরতে পারি, আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু ঐ কচি মেয়েটা, ঐ হতচ্ছাড়িটার কি হবে?

এবার বুঝলেন অবুঝ যুবরাজ। বললেন—ঠিকই বলেছ মাসি, তাহলে হীরাকে আমি কোনদিন পাবো না। আমাকে অন্য উপায় দেখতে হবে।

সকাল হতেই ফিরে এলেন নিজের শিবিরে ঔরংজীব। কিছু দাঁতে কাটবার আগেই ডেকে পাঠালেন বিশ্বাসভাজন মুর্শিদ কুলি খাঁকে। এমনিই তাঁর মনের উদ্বেগ। খাঁ সাহেব আসতেই তাঁকে মনের কথা সবিস্তারে প্রকাশ করে বললেন।

শুনে খাঁ সাহেবের রক্ত টগবগ। এতবড় আস্পর্ধা লোকটার! যুবরাজ বিয়ে করতে চাইছে আর ঐ লোকটা দেবে বাগড়া? আগে ঐ সইফ খানটাকেই শেষ করার দরকার। ওরা যদি তারপর আমাকে মেরে ফেলে, ফেলবে। তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আপনি তো মেহেরবান, হীরাকে পাবেন।

ঔরংজীব খাঁটি মুসলমান। বললেন—তা আমি জানি খাঁ সাহেব—আমার জন্যে মরতে আপনি ভয় পাবেন না। কিন্তু আমার মাসি যে বিধবা হয়ে যাবে। সেটা তো ঠিক নয়। কোরাণ তো এ কাজ অনুমোদন

করে না। বরং সাহসভরে সইফকে সব কথা খুলে বলে আমার প্রস্তাবটি তাঁকে জানান।

'জো হুকুম' বলে মুর্শিদ কুলি খাঁ রওনা হয়ে গেলেন।

ঔরংজীব বা মুর্শিদ কুলি খাঁ যা ভেবেছিলেন, কর্মক্ষেত্রে তা ঘটল না। সইফ দারুণ খুশি হয়ে যুবরাজকে সেলাম পাঠিয়ে দিলেন খাঁ সাহেবের মাধ্যমে। আরও বলে পাঠালেন—উত্তরটা তিনি এখনই খাঁ সাহেবকে দিচ্ছেন না। যুবরাজের মাসিমাকে আমি পাল্কিতে করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে-ই গিয়ে সব কথা জানিয়ে আসবে।

একথা বলে খাঁ সাহেবকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি সোজা অন্দরমহলে মালিকা বানুর কাছে চলে গেলেন। আর বললেন—তুমি নাকি ভয় পেয়ে আপত্তি জানিয়েছ। আরে এতে ক্ষতিটা কি? দিলরাস বানুকে অবশ্য আমি চাই না। তবে তার উপপত্নী চত্তর বাঈকে যদি ঔরংজীব পাঠায় তবে তার পরিবর্তে হীরাকে দিতে তো আমার আপত্তি থাকতে পারে না। যাও, এই প্রস্তাব তুমি গিয়ে যুবরাজকে বলে এসো।

মালিকা বানু দারুণ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আবার ঘরে সপত্নী! তাছাড়া মাসি হয়ে কি করে এমন কথা বোনপোকে আমি বলি।

রেগে গেলেন সইফ খান দারুণ ভাবে। একটু চিৎকার করে স্ত্রীকে বললেন—যাও মালিকা, তোমাকে যেতেই হবে। অন্ততঃ নিজের প্রাণের মায়া যদি তোমার থাকে, তবেই যাও।

বাধ্য হয়ে মাসি গেলেন যুবরাজের কাছে পাল্কী চড়ে।

ঔরংজীব মাসির কাছে সব শুনে খুশিতে চিৎকার করে উঠলেন। দিলরাসের কথা তাঁর মনেও এল না বুঝি। বললেন—এতে তাঁর কিছু-মাত্র আপত্তি নেই। একজন খোজাকে দিয়ে মালিকা স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন। তারপর······

তারপর সেই আহু-খানা, সেই মৃগ-উদ্যানের হরিণী, সেই কোকিল-কণ্ঠী তাঁর ঘরে এল। আসার আগে একদিন মীর খলিলের এই ক্রীত-দাসী স্বামী ঔরংজীবকে পরীক্ষা করে বসলেন এক পেয়ালা মদ যুবরাজের

হাতে তুলে দিয়ে। পান দোষকে গভীরভাবে ঘৃণা করতেন যে যুবরাজ ভালবাসার খাতিরে মোহমুগ্ধ বিবশ দৃষ্টিতে সুরাপাত্রটি ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলেন। যেই ধরা অমনি ওই রূপের যাদুকরী পেয়ালাটি ছিনিয়ে নিয়ে হেসে বলে উঠলেন—আমি শুধু তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস। নইলে তোমার ব্রতভঙ্গ করতে কি আমার ইচ্ছে আছে গো।

হায়রে এতো ভালবাসা, এতো মোহমুগ্ধতা, এতো যৌবন, এতো উপভোগ সবই বিনষ্ট হয়ে গেল। হীরা বাঈ—ঔরংজীবের প্রিয় জৈনা-বাদীর যৌবন সম্পূর্ণ ফুটে ওঠার আগেই বুঝি ঝরে গেল। অকালমৃত্যু এসে ঔরংজীবের অন্দরমহলকে শোকের কালিমায় লিপ্ত করে গেল। কদিন মুহ্যমান হয়ে রইলেন যুবরাজ। পিতার ভ্রূকুটি, কতো বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে যাকে বুকের নিভৃত আশ্রয়ে রেখেছিলেন—এমনি করে সে ফাঁকি দিয়ে গেল!

সে অভাব পূরণ কি করতে পেরেছিলেন তাঁর পার্সী বধূ দিলরাস বানু বেগম? বোধকরি না। শাহনওয়াজ খান সফারীর এই কন্যাটির সঙ্গে ঔরংজীবের বিয়ে হয়েছিল দৌলতাবাদে। তারিখটি ছিল ৮ মে ১৬৩৭। দারুণ উৎসব আর জাঁকজমক করেছিলেন শাজাহান। একে একে এঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে পাঁচটি সন্তান জেবউন্নিসা (১৫. ২. ১৬৩৮—২৬. ৫. ১৭০২), জিনাত-উন্নিসা (পাদিশাহ বেগম—৫. ১০.১৬৪৩—৭.৫. ১৭২১), জুবদাত-উন্নিসা (২. ৯. ১৬৫১—৭. ২. ১৭০৭), মুহম্মদ আজম (২৮. ৬. ১৬৫৩—৮. ৬. ১৭০৭) এবং মুহম্মদ আকবর (১১. ৯. ১৬৫৭—নভেম্বর ১৭০৪)।

পাঁচটি সন্তানের জননী হয়েও সুখী হলেন না দিলরাস বানু। আর শেষ পুত্রটি যখন এক মাস মাত্র তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটল। এই শেষ পুত্রটি পরে মানুষ হয়েছিলেন বাবা আর বড়দিদির স্নেহ সান্নিধ্যে। বড় হয়ে পিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহও করেছিলেন। দিলরাস বেঁচে থাকলে এসব তাঁর বেদনার কারণ হত। হয়তো ঔরংজীবের হাতেই তাঁকে মরতে হত। শুধু সন্তানের জন্মদাত্রীর এর চেয়ে বেশি কি সম্মান হত? হলেই

-বা প্রধানা মহিষী—পাটরাণী কি হতে পেরেছিলেন ?

যে পাটরাণীও হতে পারেননি রাজপুত মহিষী নবাব বাঈ, যদিও প্রধানা মহিষীদের তিনি অন্যতমা ছিলেন, তবুও। তাঁর পিতা ছিলেন রাজপুত—কাশ্মীরের রাজৌরী প্রদেশের শাসনকর্তা রাজু। এঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনটি সন্তান—মুহম্মদ সুলতান (১৯.১২.১৬৩৯—৩.১২.১৬৭৬), মুহম্মদ মুয়াজ্জাম (শাহ আলম—১, ৪. ১০. ১৬৪৩—১৮. ২. ১৭১২) এবং বদর-উন্নিসা (১৭. ১১. ১৬৪৭—৯.৪. ১৬৭০)। নবাব বাঈএর পুত্রই হলেন ঔরঙ্গজীবের উত্তরাধিকার বাহাদুর শাহ। সেদিক থেকে ঔরংজীবের অন্দরমহলে নবাব বাঈয়ের একটা প্রতিষ্ঠা অবশ্যই ছিল। কিন্তু যাকে বলে প্রিয় মহিষী তা কিন্তু আদৌ ছিলেন না। তাঁর সঙ্গই তেমন পছন্দ করতেন না ঔরংজীব। শুধু উপভোগের পাত্রী তিনি কখনও কখনও। একটা অবহেলার মধ্যে অন্দরমহলের এক কোণে তিনি জীবন অতিবাহিত করতেন। সে এক বড়ো নিরা-নন্দকর জীবন।

ঔরংবাদী মহলের গর্ভে এসেছিল ঔরংজীবের একটি মাত্র সন্তান—একটি কন্যা মিহর-উন্নিসা (১৮. ৯. ১৬৬১—২৭. ১১. ১৬৭২)। কতো অল্প বয়সেই এই কন্যা আবার মায়ের সব স্নেহের বন্ধন অস্বীকার করে চিরতরে চলে যায়। কি বেদনাবহ জীবন। কিন্তু সে বেদনা বেশিদিন বহন করতে হয় নি ঔরংবাদী মহলকে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের নিদারুণ প্লেগ এসে তাঁর সকল অবহেলার অবসান ঘটাল।

কিন্তু হীরা বাঈ-এর সকল অভাব পূর্ণ করে ঔরংজীবের যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বকে সার্থক করেছিলেন যিনি তিনি উদিপুরী মহল। না, উদিপুরী কোনো রাজপুত কন্যা নন, কোনো হিন্দু বা মুসলমান রমণীও নন। তিনি ছিলেন জর্জিয়া থেকে আগত এক খৃষ্টান কন্যা। ঔরংজীবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শাহজাহানের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকো তাঁকে কিনেছিলেন ক্রীতদাসী হিসেবে। সেই থেকেই তিনি দারার অন্দরমহলে বাস করে আসছিলেন। দারার অপঘাতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রীতদাসী দারার হারেম থেকে চলে এলেন ঔরংজীবের হারেমে। (যদুনাথ সরকার একে

অবশ্য কাশ্মীরী-কন্যা বলে মনে করেন। কারণ মসির-ই-আলমগিরি বলেছে যে তিনি ছিলেন বাঈ—যে উপাধি মাত্র হিন্দুরমণীর নামের শেষে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।)

উদিপুরী মহল জন্ম দিয়েছিলেন ঔরংজীবের প্রিয়তম পুত্র (এবং অপদার্থতমও বটে) কাম-বখ্‌শকে (২৪.২.১৬৬৭—৩. ১. ১৭০৯)। দারার হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৬৫৯ তারিখে। এর পরে কোনো এক সময়ে উদিপুরী ঔরংজীবের হারেমে আসেন এবং পাটরানীর লোভনীয় সিংহাসনটি অধিকার করে বসেন। সেই সিংহাসনে তিনি আসীন ছিলেন তার মৃত্যুর শেষ দিনটি অবধি।

মোগল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য কন্যা জেবউন্নিসা। শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট ঔরংজীবের কন্যা এই জেবউন্নিসা। প্রথম বাদশাহ বাবরের কন্যা গুলবদনের মতো এতোখানি নামকরা না হলেও এই বিদূষীকে আমরা মনে রেখেছি তাঁর নানা গুণের কারণে। তিনি বিদূষী কবি, প্রীতিপরায়ণা ভগিনী, দীনের বন্ধু, গৃহকর্মে নিপুণ, সাহসী শিকারী—সবই। আবার পরম দুঃখিনীও। তাই তাঁর জীবন যেন কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

পিতা ঔরংজীব তখন দৌলতাবাদে। তাঁর হারেমও আছে তাঁর সঙ্গে। আছেন অন্যতমা প্রিয় মহিষী দিলরাস বান্নু যাঁর কথা আমরা আগের অধ্যায়ে বলেছি। এখানেই জন্ম হল তাঁর গর্ভে ঔরংজীবের সুখ্যাত কন্যা জেবউন্নিসার। জন্মের পরই তিনি লালিতপালিত হতে লাগলেন এমন একজন অভিভাবিকার কাছে যিনি ছিলেন একজন বিদূষী মহিলা। হাফিজা মরিয়মের কাছে মানুষ হয়েছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে একটি কবিপ্রাণ বিদ্যালিপ্সু সত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল।

মোগল হারেমের মেয়েদের সঙ্গে ঔরংজীবও লক্ষ্য করলেন এই ছোট্ট মেয়েটি কেমন করে তার অতি শৈশব থেকেই গভীর পাঠানুরাগ প্রকাশ করে চলেছিল। বিস্মিত হতেন সবাই ছোট্ট ফুটফুটে এই সম্রাট-কন্যার অভূতপূর্ব স্মরণশক্তি দেখে। প্রতিদিন হাফিজা মরিয়ম, কোন্ সেই ছোট্ট বেলা থেকে, মুখস্থ করাতেন কোর্-আনের প্রতিটি সূরা। তাই কৈশোরে পা দিতে না দিতেই জেবের কণ্ঠস্থ হয়ে গেছিল সমগ্র কোর্-আন-শরিফ। একদিন তার পরীক্ষাও দিয়ে দিলেন তাঁর শাহনশাহ সম্রাট পিতার কাছে। ঔরংজীব বিস্মিত, ঔরংজীব মুগ্ধ! বিস্মিত আনন্দে আর পরম স্নেহে কন্যাকে করলেন সানন্দ পুরস্কারে ভূষিত। হাতে তুলে দিলেন তিরিশ হাজার আশরফির মঞ্জুষা।

শুধু পাঠ নয়, লিখনশৈলীর সৌকর্যেও নিজেকে স্বয়ংশিক্ষিত করে

মো. অ.—৮

তুলেছিলেন জেবউন্নিসা। ফার্সী স্বাক্ষরের তিনটি ছাঁদ—নস্তালিক, নস্‌খ আর শিকাস্তা। তিনটি ছাঁদকেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন পরম যত্নে আর নিষ্ঠায়। তার মুক্তাক্ষর ছিল তাঁর পিতার গর্বের বিষয়। আর ধর্মনিষ্ঠ (?) পিতার কন্যা বলেই হয়তো কৈশোরেই জেবের মধ্যে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল একটি ধর্মনিষ্ঠ সত্তা। সেজন্য কোর্‌-আন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করতে শুরু করেছিলেন আরবী ধর্মতত্ত্বের সুগভীর পাঠ। এমন জ্ঞানস্পৃহা বাস্তবিকই সুদুর্লভ, বিশেষত হারেমে বন্দিনী কোনো ললনার কাছে—যাঁর কাছে বিলাসিতার নিত্য প্রলোভন নিত্য হাতছানি দিয়ে চলেছে। এই ধর্মনিষ্ঠাই এই কন্যাটিকে ঔরংজীবের ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্রী করে তুলেছিল। কন্যার সঙ্গে ধর্মের আলোচনা করে এই পরমবিষয়ী, আপাতনিষ্ঠুর মানুষটি খুবই আনন্দ পেতেন, শান্তি পেতেন। একটি চিঠিতে ঔরংজীব প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ):

> ভগবানকে বন্দনা করিয়া ও প্রেরিত পুরুষকে প্রণিপাত করিয়া (লিখিতেছি)।—খোদার আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক। পুণ্যমাস রমজান আসিয়াছে। পরমেশ্বর তোমার উপর উপহার স্বরূপ কর্তব্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই মাসে স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত ও নরকদ্বার রুদ্ধ হয়, বিপ্লবকারী শয়তানেরা কারানিবদ্ধ থাকে। রমজানের ধর্ম নিয়মাদি প্রতিপালনের জন্য আমরা উভয়েই যেন ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হই।...'

এই ধর্মপ্রাণতা জেবউন্নিসাকে ক্রমশ বিলাস যাপন থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানরাজ্যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। জ্ঞানের অমরাবতীতে জেবের ছিল নিত্য বিচরণ। সেজন্য ক্রমাগত সংগ্রহ করে চলেছিলেন নানা ধর্মপুস্তক। ফলে গড়ে উঠেছিল একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। নানা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য পুঁথিতে গ্রন্থাগারটি মোগল আমলের শ্রেষ্ঠ পুস্তকাগারে পরিণত হয়েছিল। জেবউন্নিসার যেটি বড়ো গুণ ছিল তা হল নিজেই জ্ঞানের অমিয়া পান করে তিনি তুষ্ট থাকতেন না। যতক্ষণ

পর্যন্ত না অপরের জ্ঞানতৃষ্ণা বর্ধিত ও নিবারিত না হয় ততক্ষণ যেন তাঁর স্বস্তি ঘটত না।

কতো দুঃস্থ ও গুণী লেখক যে তাঁর পোষকতা পেতেন তারও ইয়ত্তা ছিল না। পণ্ডিত ও গুণী মৌলবীদের জন্য তাঁর দ্বার ছিল সদা-উন্মুক্ত। তাঁরা জেবউন্নিসার জন্য কখনও লিখে চলেছেন নতুন নতুন বই, কখনও বা নকল করে চলেছেন কোন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। এঁদের মধ্যে অনেকেই সে সময়ে খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন। যেমন, নাশির আলি, সায়াব, শামসোয়ালিউল্লা, বেরাজ প্রভৃতিরা। অবশ্য মুল্লা সফীউদ্দীন আর্দবেলীর খ্যাতির কাছে এঁরা নিষ্প্রভ ছিলেন। আর্দবেলী থাকতেন কাশ্মীরে। তিনিই কোরানের আরবী মহাভাষ্য ফার্সীতে অনুবাদ করেন। শিষ্যা জেবউন্নিসার প্রতি প্রবল স্নেহবশত এই অনুবাদ তিনি তাঁর নামেই প্রচারিত করে নাম দেন 'জেব-উৎ-তফাসির'। এমনি করে অনেকেই জেবের নামের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টিকে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে জেবউন্নিসার নামে বেশ কয়েকটি বই প্রচারিত থাকলেও তিনি সে সবের লেখিকা ছিলেন না। কিন্তু এ থেকে তাঁর গুণগ্রাহিতা এবং অধিকার দুই-ই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যায়।

জেবের এই গুণগ্রাহিতা কোনো রাজকীয় বিলাস ছিল না। ছিল অন্তরের মণিকোঠার সম্পদবিশেষ। সেই মণিকোঠায় বাস করতো একটি কবিমানসী। কোন্ দূর বাল্যকালেই কোরান শরীফের সূরা আবৃত্তি করে যার কান অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ছন্দে—কৈশোর-যৌবনের সন্ধি-ক্ষণে সেই অন্তরেই বাজতে শুরু করেছিল বীণাপাণির সঙ্গীত বীণাটির ঝঙ্কারধ্বনি। বাইরের রূপের অজস্র দীপমালার স্নিগ্ধ কমনীয় উজ্জ্বল-তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছিল তাঁর অন্তরতম সেই কবিমানসী।

খুব ছোট্ট থেকেই কবিতা পড়তে, ভাবতে আর লিখতে ভালবাসতেন জেবউন্নিসা, ঔরংজীবের এই দুহিতাটি। ঔরংজীব আদৌ পছন্দ করতেন না কবিদের। অথচ তাঁর অন্দরমহলেই নিত্যই জন্ম নিচ্ছে কবিতা, জেবের কলম থেকে। ঔরংজীব যেন প্লেটো, কবিদের নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েই যেন খুশী। অথচ অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে

বন্দিনী আর সংগুপ্ত রেখে জেব রচনা করে চলেছেন কতশত মখ্‌ফী।

যে সমস্ত কবি গুপ্তভাবে কবিতা লিখে তা ছদ্মভাবেই প্রচার করেন, তাদের ফার্সী ছদ্মনাম হল মখ্‌ফী। জেবউন্নিসার নামেও প্রচারিত আছে নানা মখ্‌ফীর সংকলন 'দিওয়ান-ই-মখ্‌ফী'। কবিতা রচনা করতে তিনি শিখেছিলেন তাঁর শিক্ষক শাহরুস্তম গাজীর কাছে। তারপর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল কাব্যচর্চার একনিষ্ঠ প্রেম। তাই প্রসাধন কলায় যৌবনেই দেখা দিয়েছিল একটা বিস্ময়কর অনাগ্রহ। মোগল হারেমে মেয়ে-বৌরা সাজসজ্জা করে না, এ তো বড়ো একটা দেখা যায় না, শোনা যায় না। ভিতরের সৌন্দর্যে মগ্ন জেবউন্নিসা সাজতে-গুজতে তেমন ভালই বাসতেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যেতো অন্যান্য অন্তঃপুরিকার সঙ্গে চৌপর খেলায় নিমগ্ন। কিন্তু তাঁদের মতো পোলো খেলায় আগ্রহ দেখান নি কখনও এই কোমলাঙ্গী যৌবনবতী।

মখ্‌ফী কবিতা তো লিখতেন আকবরের পত্নী স্বয়ং সলীমা সুলতানা বেগম, লিখতেন নূরজাহানও। কিন্তু জেবের মখ্‌ফীতে বেদনার যে সুর-মূর্ছনা তা অন্যত্র দুর্লভ। জেবউন্নিসার মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পর যখন তাঁর ছদ্মনামা কবিতাগুলি সংগৃহীত হল, তখন তাঁর হৃদয়ের গোপনতম কাহিনীগুলি যেন আমরা কবিতায় মুখরিত হতে দেখলাম। সেলিমগড়ের দুর্গে বন্দিনী জেবউন্নিসা একটি কবিতায় লিখেছেন :

'কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, যতদিন চরণযুগল,
বন্ধু সবে বৈরী তোর, আর পর আত্মীয়-সকল।
সুনাম রাখিতে তুই করিবি কি, সব হবে মিছে,
অপমান করিবারে বন্ধু যে গো ফেরে পিছে পিছে।
এ বিষাদ-কারা হতে মুক্তি-তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্‌ফী, রাজচক্র নিদারুণ, বিরূপ কঠোর :
জেনে রাখ বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে না লৌহ-কারাগার।
নিগড় নিবদ্ধ পদে কী সুদীর্ঘ একাল যাপন

সখা যত, শত্রু আজি—
আগন্তুক আত্মপরিজন।'

—কি হয়েছিল, তাই জেবউন্নিসার এতো দুঃখ, এতো বিলাপ, এতো বেদনামথিত হতাশ্বাস! সেও এক ভালোবাসার ইতিহাস।

ঔরংজীবের এক পুত্র মুহম্মদ আকবর, জেবউন্নিসার ছোট ভাই, গর্ভধারিণী দিলরাস বানুর কনিষ্ঠ সন্তান। খুব ভালবাসতেন জেব তাঁর থেকে উনিশ বছরের ছোট এই ভাইটিকে। মনের যা কিছু কথা, সংবাদ, প্রার্থনা অসংকোচে নিবেদন করতেন এই সহোদরটিকে। দুজনের প্রতি দুজনের অগাধ বিশ্বাস। শতেক চিঠিতে ধরা আছে এই ভাইবোনের স্নেহভালবাসার শতেক অভিজ্ঞান।

এই আকবরই একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন পিতা ঔরংজীবের বিরুদ্ধে। মোগল ইতিহাসে এ কোনো নতুন কথা নয়। নতুন কথা নয় পিতার কঠিন হাতে পুত্রের গভীরতম শাস্তির সংবাদও। তাই নিষ্ঠুর ঔরংজীব—তিন তিনটি ভাই আর পিতা এমনকি কনিষ্ঠা ভগিনীও যাঁর হৃদয়হীনতার নিষ্ঠুর শিকার, এবার পুত্র আকবরও সেই নিষ্ঠুরতার শিকার হলেন।

খবর পেয়ে সসৈন্যে পুত্রের পশ্চাদ্ধাবন করলেন ঔরংজীব। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী। ঔরংজীবের সৈন্যেরা দখল করে নিল আকবরের পরিত্যক্ত শিবির। সেখানে পাওয়া গেল ভাই আকবরকে লেখা দিদি জেবউন্নিসার বেশ কয়েকখানি চিঠি। ও হো, তাঁর অন্দরমহল থেকে তাঁরই কন্যা তাঁরই পুত্রকে জোগাচ্ছে পিতৃদ্রোহের ইন্ধন! সরষের মধ্যেই তাহলে ভূত! ঔরংজীবের স্বভাবের মধ্যে অন্য কি ঔদার্য ছিল জানি না, তবে 'ক্ষমা' শব্দটিকে যেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিধান থেকে তিনি বাদ দিয়েছিলেন।

অতএব কন্যার প্রতি প্রবল বিরাগে তাঁকে চরম শাস্তি দিতে এগিয়ে এলেন ভারতের তৎকালীন ভাগ্যবিধাতা শাহনশাহ ঔরংজীব পাদশাহ। কন্যার যাবতীয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করা হল। সম্পত্তির মূল্যও তো কম ছিল না—৬৩ মোহর—৫৬৬৮৬৬ টাকা—

পাঁচ লাখেরও বেশি। এসব অর্থ দিয়েই জেবউন্নিসা কতো বিধবাকে দিয়েছেন আশ্রয়, কতো আতুরকে করেছেন অন্নদান, কতো দুঃখীর জীবনে ফুটিয়েছেন প্রত্যাশার আনন্দময় পুষ্প। সব বাজেয়াপ্ত হল। সেই সঙ্গে বন্ধ হল বার্ষিক চার লক্ষ টাকার বৃত্তি। আর তার পরেই উন্মুক্ত হয়ে চিরতরে বন্ধ হল দিল্লীর সলীমগড়ের লৌহকারাগারের ভারী দরজার পাল্লা দুটো।

বাইশটি বছরের দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে জেবউন্নিসার যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রান্ত হল। কারাগারেই উদ্‌যাপিত হল বাণপ্রস্থের ব্রত। তারপর ৭ দিন একটানা রোগভোগ। তারপর 'নাই নাই আশা নাই, খুলিবে না লৌহ-কারাগার' বলে যে আক্ষেপ ক্রমাগত করে চলেছিলেন বন্দিনী জেব-উন্নিসা তারও একদিন অবসান হল। মোগল অন্দরমহলে কতো বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে যায়; ঘটে গেছিলও। ঐ কারাগারের দরজাও একদিন খুলে গেল। সেদিনটা ছিল ২৬ মে ১৭০২ খৃষ্টাব্দ। জেবউন্নিসা তখন সবে চৌষট্টি অতিক্রম করেছেন। মৃত্যু এসে ঐ ভারী পাল্লার দুর্গ-দরজা খুলে দিয়ে জেবউন্নিসার চিরমুক্তি ঘটাল।

তারপরেও অন্দরমহলে বহির্মহলে ঘটনা ঘটে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হল। দান-খয়রাতি হল। জাহানারার দেওয়া 'তিশ্‌ হাজারী' উদ্যানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। তাও আজ আর নেই।

অথচ এমনিভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা কবিজীবন শেষ হয়ে যাবে—এ তো প্রার্থনার বিষয় ছিল না। তাঁরও অন্তরে প্রেম ছিল, ছিল আর পাঁচটি বিবাহিত নারীর মতো বেঁচে থাকার, সংসার রচনার স্বপ্ন। কিছুই হল না। দারাশুকোর পুত্র সোলেমানশুকোর বাগ্‌দত্তা হয়েও নীড় রচনার স্বপ্ন তাঁর সার্থক হয়নি। কাফের দারার ছেলের সঙ্গে 'ধর্মিষ্ঠ' ঔরংজীবের কন্যার বিবাহ পিতার প্রবল আপত্তির কারণে সম্ভব হয় নি।

তা যদি নাই বা হল ইরানের দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের পুত্র মির্জা ফারুখের সঙ্গে কেন বিবাহ হল না তাঁর! সে তো ভালবাসতেই চেয়েছিল জেবকে। না, জেবের আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ফারুকের প্রেমকে অবহেলা দেখিয়েছিল। মির্জা ফারুক চেয়েছিলেন জেবউন্নিসার কাছে 'মিষ্টান্ন' অর্থাৎ চুম্বন। জেবউন্নিসা বুঝেও তাঁকে বলেছিলেন, 'মিষ্টান্ন' পাকশালায়

সন্ধান করতে। এও তো জেবের কম অহঙ্কারের কথা নয়! যে নারী স্বাধীনভাবে বিচরণের স্বাধীনতা পেয়েছিল, সে কেন এমনভাবে ভালবাসার অমর্যাদা করল? তবে কি জ্যাঠা দারাশুকোর স্নেহপ্রেমে মুগ্ধা জেব তাঁর জীবনে ঐ সোলেমানকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারেন নি! হয়তো তাই। তাতেই বুঝি শিবাজীকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। হয়তো ধর্মনিষ্ঠার কারণেও তিনি দূরবর্তিনী হয়েছিলেন।

অথচ মোগল অন্দরমহলে অন্য একটি বিষয়ের অবাধ গতায়াত ছিল। তা হল মিথ্যা কলঙ্কের। অবশ্য যেখানেই যত বন্ধন, সেখানেই ঘটে তত শিথিলতার প্রশ্রয়। তাই বুঝি জেবউন্নিসার পবিত্র হৃদয়ের চারপাশে অকারণ কলঙ্কের কালিমা তাঁর প্রেমসুরভিত জীবনটিকে কালিতে কলঙ্কে লিপ্ত করতে চেয়েছিল। কিংবদন্তী বলে—ঔরংজীব তখন দারুণ অসুস্থ। সেই সুযোগে স্বাধীনা জেব তাঁর উজীর পুত্র আকিল খাঁর প্রেমে মগ্ন হন। অসামান্য রূপবান এবং অসীম বীরত্বপূর্ণ আকিল খাঁ একদা যখন সকালে প্রাসাদ শিখরে জেবউন্নিসাকে দেখে লিখলেন এ যেন 'প্রাসাদ-শিরে রক্তিম স্বপ্নপ্রতিমার প্রকাশ'। জেব জানালেন কবিতায় 'জোর জবরদস্তি বা স্বর্ণমুদ্রা' কিছুর দ্বারাই এই প্রতিমা লভ্য হবার নয়। শেষে আকিল খাঁ অন্দরে প্রবেশ করল এক রাজমজুরের বেশে। তখনও না। শেষে উভয়ে পরস্পরের সন্নিকটে এলেন। ঔরংজীব ভাল হয়ে সব শুনলেন। এবং স্বয়ংবরা কন্যার মনের ইচ্ছা জানতে পেরে একদিন গরম জল ঢেলে আকিল খাঁকে মেরে ফেললেন। এ জন্যেই কি জেব-উন্নিসা কবিতা লিখেছিলেন 'জগতের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি হল আত্মবলিদান?' কিছুই জানি না।

অথবা কারাগারে লৌহবেষ্টনীতে বসে যখন তিনি মখ্‌ফী লেখেন 'শেষ আশা'—

'পারি না সহিতে আমি আর
তোমার বিচ্ছেদ আর তিক্ত এই মর্মগ্লানিভার;
নিপীড়িতা আমি প্রভু, মুক্ত কর আমার আত্মায়;
ক্লান্ত, ক্ষিন্ন, ভগ্নবুকে—মগ্ন আমি, হের, হতাশায়!

তখন কি বুঝতে পারি কার উদ্দেশ্যে তিনি এই কবিতা রচনা করেছেন—সোলেমান না আকিল খাঁ? অথবা যাঁর প্রতি প্রেম ধাবিত হলে আর কাউকে ভালবাসার প্রয়োজন হয় না—সেই ঈশ্বরকে?

—